সাজাহান

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

সাজাহান

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ২০৩

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
অগ্রহায়ণ ১৪০৯ ডিসেম্বর ২০০২

দ্বিতীয় সংস্করণ দ্বিতীয় মুদ্রণ
অগ্রহায়ণ ১৪১৮ নভেম্বর ২০১১

প্রকাশক
মোঃ আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০ ফোন ৯৬৬০৮১২ ৮৬১৮৫৬৭

মুদ্রণ
সুমি প্রিন্টিং এ্যান্ড প্যাকেজিং
৯, নীলক্ষেত, বাবুপুরা, ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মূল্য
একশত পঁচাত্তর টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0202-3

ভূমিকা

উনবিংশ শতকের শেষদিকে যাঁদের প্রতিভা ও প্রভাবে বাংলা নাট্যমঞ্চের বিপুল প্রসিদ্ধি ও শিল্পসমৃদ্ধি ঘটে—তাঁদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হচ্ছেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩)। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাব ও জনপ্রিয়তা কবিতা ও গানের মধ্যদিয়ে হলেও নাট্যকার হিসেবেও তিনি খুব দ্রুত খ্যাতি অর্জন করেন। রবীন্দ্রযুগে বাস করেও তিনি সাহিত্য ও গানে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব বজায় রাখার মতো দুঃসাধ্য কাজটিতে সফল হয়েছিলেন।—

রবীন্দ্রনাথ এই কবির মধ্যে দেখেছিলেন "আত্মবিশ্বাসের একটি অবাধ সাহস।" তাঁর 'মন্দ্র' কাব্যগ্রন্থকে তিনি অভিনন্দিত করেছিলেন 'অবলীলাকৃত' ও 'নতুনতায় ঝলমল' কাব্যপ্রতিভার জন্য। অবশ্য তাঁর জনপ্রিয় ঐতিহাসিক নাটক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নীরব ছিলেন।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর অসাধারণ 'বাণী ও সুরের' সমন্বয়ে রচিত দেশপ্রেমমূলক গানগুলোর মধ্যদিয়ে বাঙালি জীবনে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি', 'বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ'—এসব গান আমাদের জীবনে অফুরন্ত দেশপ্রেম ও প্রেরণার উৎস। এছাড়া ডি. এল. রায়ের হাসির ছড়া ও গানগুলো এক ভিন্নমাত্রিক সমাজসচেতনতা এবং নির্মল আনন্দের উৎস।

বাংলা নাটকের ২০০ বছরের গৌরবময় ইতিহাসে দ্বিজেন্দ্রলাল একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। উনিশ শতকের শেষপর্যায়ে তিনি প্রহসন থেকে শুরু করে গীতিনাট্য, সামাজিক, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক—তখনকার নাট্যাঙ্গনে বিদ্যমান প্রায় সব কটি ধারা অবলম্বন করে নাটক লেখা শুরু করেন। তবে সমালোচকদের মতে তাঁর জনপ্রিয় ঐতিহাসিক নাটকগুলোর মধ্যেই তাঁর প্রতিভার পূর্ণ স্ফূরণ ঘটেছে।

একটি শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান পরিবারের গৌরবময় ঐতিহ্যের মধ্যদিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের শিক্ষা ও রুচির বিকাশ ঘটে। প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র ডি. এল. রায় ছিলেন ছাত্র হিসেবে অত্যন্ত মেধাবী। পরবর্তীতে কৃষিবিদ্যা অধ্যয়নের জন্য তিনি বিলেতে যান এবং ফিরে এসে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে সরকারি চাকরিতে যোগদান করেন।

স্বাধীনচেতা ডি. এল. রায়ের সাথে তার ওপরওয়ালাদের প্রায়ই সংঘর্ষ ঘটত। এ-জন্য চাকরিজীবনে আশানুরূপ পদোন্নতি তাঁর হয়নি। অবশ্য কর্মজীবনের শেষদিকে তিনি ল্যান্ড রেকর্ডস ও এগ্রিকালচারের সহকারী ডিরেক্টর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

বিবাহিত জীবনে অত্যন্ত সুখী ডি. এল. রায় ছিলেন একটি পুত্র ও একটি কন্যা সন্তানের জনক। তাঁর পত্নীর অকালমৃত্যু তাঁর জীবন ও সাহিত্যের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে।

তিনি 'পূর্ণিমা মিলন' নামে একটি সম্মেলনের প্রতিষ্ঠাতা ও ইভনিং ক্লাবের সভাপতি ছিলেন। তাঁর এইসব সাংগঠনিক আয়োজন রবীন্দ্রনাথসহ সেকালের সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতের রথী-মহারথীদের অংশগ্রহণে সবসময় প্রাণবন্ত থাকত।

রবীন্দ্রনাথের সাথে একসময় তাঁর সম্পর্কের অবনতি ও সাহিত্যিক মতান্তর ঘটে; যা ছিল সে-যুগের একটি আলোচিত ঘটনা।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ছিলেন সরাসরি, বলিষ্ঠ ও সুবোধ্য লেখার স্বপক্ষে। রবীন্দ্রনাথের বিমূর্ত ভাবনা ও শিল্পচিন্তার আলো-আঁধারি তাঁর কাছে দুর্বোধ্য ও নিরর্থক বলে মনে হত। একসময় প্রধানত এই 'দুর্বোধ্য সাহিত্য'কে আক্রমণ করেই তিনি রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কলম ধরেন। পরে অবশ্য তিনি অনুতপ্ত হন ও রবীন্দ্রপ্রতিভার শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করে নেন।

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল ও তাঁর ঐতিহাসিক নাটক

দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলোর মধ্যে *সাজাহান* ও *নূরজাহান*—এই দুটি নাটকই শ্রেষ্ঠ। *সাজাহান* ও *নূরজাহান* হল আদর্শ ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডির উদাহরণ এবং এদের মধ্যে প্রথমটি তার বিস্তৃতি ও দ্বিতীয়টি তার গভীরতার জন্য বৈশিষ্ট্যময়।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাবালুতামুক্ত একধরনের ঋজু আধুনিকতা ছিল। তাই সে-সময়কার জনপ্রিয় পৌরাণিক নাটকের ধর্মীয় আবহে তাঁর প্রতিভা সাফল্যলাভ করেনি। ঐতিহাসিক নাটকগুলোর উত্থানপতনময়, কর্মমুখর ও দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ মানবজগতে তাঁর শিল্পসিদ্ধি ঘটেছে বেশি।

তাঁর চিন্তায় ও চৈতন্যে ধর্ম, পরকাল ও দেবতার স্থান ছিল গৌণ—একধরনের অসাম্প্রদায়িক বোধ ছিল তাঁর সহজাত। ঐতিহাসিক নাটক লিখতে গিয়ে তিনি ইতিহাসের প্রতি সনিষ্ঠ থেকেছেন; পক্ষপাত করেননি। ঔরঙ্গজেব সম্পর্কে তিনি লিখেছেন : "ঔরংজীবকে আমি পিশাচরূপে কল্পনা করি নাই—যেরূপ টড ও অর্ম করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে সরল ধার্মিক মুসলমান-রূপে কল্পনা করিয়াছি। তাঁর অত্যাচার অত্যধিক গোঁড়ামির ফল। ইসলামধর্ম প্রচারের দৃঢ়-সঙ্কল্পপ্রসূত।"

ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে স্বদেশ ও ধর্মের লুপ্ত গৌরব ও ইংরেজ আধিপত্য সম্পর্কে সচেতনতা দেখা দেয়; তারই প্রভাব পড়ে সাহিত্য ও নাটকে। বঙ্কিমচন্দ্র এ-সময়ই রচনা করেন *আনন্দমঠ* (১৮৮২)। স্বদেশী ভাবধারা ও বিদ্রোহকে মূর্তিমান করার লক্ষ্যে খোঁজ পড়ে ইতিহাসের আপোষহীন বীরদের। এছাড়া পরাধীন দেশে বাকস্বাধীনতার অবকাশ সংকীর্ণ থাকায় রূপক কাহিনীরও প্রয়োজন ঘটে। তাই এসময় মোগল বাদশাহদের বিরুদ্ধে রাজপুতানা ও মহারাষ্ট্রীয় বীরদের সংগ্রামকে কেন্দ্র করে লেখা হয় অনেক দেশপ্রেমমূলক নাটক। দেশপ্রেমের প্রয়োজন হলেই সাহিত্যিকরা রাজস্থানের দ্বারস্থ হতেন। স্বাভাবিকভাবেই মুসলমান বাদশাহদের বিরুদ্ধে নাটকে উচ্চারিত সংলাপগুলোতে ধ্বনিত হয়েছে 'যবন-বিষোদগার'; যা মুসলিম-সংবেদনে আঘাত করেছে এবং এসব লেখা তাদের কাছে সাম্প্রদায়িক সাহিত্য বলে মনে হয়েছে। আবার বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের (১৯০৫) সময় হিন্দু-মুসলিম মিলন ও ঐক্যের প্রয়োজন অনুভূত হয়। এরও প্রতিফলন ঘটে নাটকে।

একজন মুসলমান বীর হিসেবে সিরাজউদ্দৌলার আবির্ভাব ঘটে। গিরিশচন্দ্রের *সিরাজউদ্দৌলা* নাটকে ইংরেজবিরোধী ভাগ্যাহত নবাব প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। *দুর্গাদাস* নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল মোগল-সেনাপতি দিলীর খাঁ'র মুখে হিন্দু-মুসলিম মিলন আকাঙ্ক্ষাময় সংলাপ যোজনা করেন যা ইতিহাসসম্মত না হলেও, সমসাময়িক বিবেচনা ও চাহিদা থেকে উদ্ভূত।

মোগল-যুগকে অবলম্বন করে ডি. এল. রায় পাঁচটি নাটক রচনা করেন। সেগুলো হচ্ছে *প্রতাপসিংহ, দুর্গাদাস, মেবার পতন, নূরজাহান* ও *সাজাহান*। প্রথম তিনটি নাটকে রয়েছে রাজপুত ইতিহাসের প্রাধান্য ও আদর্শবাদের জয়। পরের দুটি নাটকে দেখা যায় মোগল-সম্রাট জাহাঙ্গীর ও আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের ঘটনা ও তাদের পারিবারিক জীবনের জটিল দ্বন্দ্ব। এইভাবেই ডি. এল. রায় সরল আদর্শবাদ থেকে ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডির গভীর বন্ধুর পথে যাত্রা শুরু করেন। বীরপূজার জনপ্রিয় পথ ধরেই তিনি মানবমনের এবং জীবনের অন্তবিহীন দ্বন্দ্ব ও রহস্যের অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন।

সাজাহান নাটকটি লক্ষ্মী ও সরস্বতীর আশীর্বাদধন্য। এটি একাধারে লাভ করেছে সমকালীন মঞ্চসাফল্য ও চিরকালীন নাট্যসাহিত্যের মর্যাদা। বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে এটি প্রায় দুর্লভ। রবীন্দ্রনাথের সুমার্জিত, অগ্রসর, আধুনিক নাটকগুলো ঠাকুরবাড়ির মঞ্চের ও শান্তিনিকেতনের বিদগ্ধ দর্শকরুচিকে স্নাত করেছে। সাধারণ জনতার অকর্ষিত রুচিকে তৃপ্ত কিংবা শিল্পবোধে দীপ্ত করার দায়িত্ব তারা নেয়নি। আবার গিরিশচন্দ্র যখন আবেগপ্রধান শস্তা সংলাপসর্বস্ব, স্থূল জনচাহিদার প্রতি লক্ষ্য করে নাটক লিখেছেন, তখন তিনি আশাতীত দর্শক আনুকূল্য লাভ করেছেন। কিন্তু তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও মেধার ফসল *ম্যাকবেথ* নাটকটির অনুবাদ দর্শক গ্রহণ করেনি। তাই *সাজাহান* নাটকটি নাট্যামোদী দর্শক-ও সাহিত্যপ্রিয় পাঠকদের কাছে এক স্বতন্ত্র ও নিজস্ব মর্যাদায় আসীন।

ইংরেজি ভাষায় নাট্যকারদের দুটি ধারায় বর্ণনা করা হয়— ড্রামাটিস্ট ও প্লে-রাইট। ড্রামাটিস্ট নাটক রচনা করেন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ও সাহিত্যসাধনার নিগূঢ় আনন্দে। অন্যদিকে প্লে-রাইট কোনো পেশাদারী মঞ্চের অর্থকরী লাভের সাথে যুক্ত থাকেন। কাজেই প্লে-রাইটকে শুধু নিপুণ সাহিত্যিক হলেই চলে না, তাকে হতে হয় পারফর্মিং আর্ট ও ব্যবসা বিষয়ে সমঝদার। শেক্সপিয়র, মলিয়ের ও বার্নাড-শ হলেন অসাধারণ ও সফল প্লে-রাইটের উদাহরণ। দর্শকসাধারণের রুচির খোরাক জুগিয়ে তাকে একই সাথে শিল্পের অত্যুচ্চ জগতে পরিভ্রমণ করিয়ে আনাই সার্থক ও সফল প্লে-রাইটের কাজ। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাণিজ্যলক্ষ্মীর রসদ যোগাতে গিয়ে সাধারণ প্লে-রাইটরা সরস্বতীকে নির্বাসিত করেন এবং পরিণামে সমকালের জ্বলজ্বলে পাদপ্রদীপ থেকে একসময় মহাকালের অতল অন্ধকারে হারিয়ে যান।

দ্বিজেন্দ্রলাল পেশাদারী নাট্যমঞ্চের সাথে যুক্ত থেকে নাটক লেখেননি, তবে তিনি সেকালের বহু মঞ্চে নাটকের যোগান দিয়েছেন। সম্ভবত তিনি প্লে-রাইট ও ড্রামাটিস্ট-এর একটি মধ্য-ভূমিকা পালন করেছেন।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বস্তুচেতনা, মানবতার স্বীকৃতি, সাম্যনীতি, উদার মতবাদ প্রভৃতি আধুনিক লক্ষণ বাংলা নাটকে পরিলক্ষিত হয়, যার একজন বলিষ্ঠ

প্রবক্তা দ্বিজেন্দ্রলাল। ইংল্যান্ডে থাকাকালীন তিনি সেখানকার সুবিখ্যাত নাট্যমঞ্চগুলোর নিষ্ঠাবান দর্শক ছিলেন। তিনি লিখেছেন : "বিলাত যাইয়া বহু রঙ্গমঞ্চে বহু অভিনয় দেখি এবং ক্রমেই অভিনয় ব্যাপারটি আমার কাছে প্রিয়তর হইয়া উঠে।"

এভাবে পাশ্চাত্য নাটক দেখার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও শ্রেষ্ঠ নাট্যসাহিত্য পাঠের মধ্যদিয়েই তিনি আধুনিক নাটকের সংহতি, গতিবেগ, ট্র্যাজিক রসচেতনা, প্রভৃতি বিষয় আত্মস্থ করেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মধ্যে বীররস সৃজনের একটি সহজাত ক্ষমতা ছিল যা বাংলাসাহিত্যে সুলভ নয়। এমনকি মহাকবি ও নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন দত্ত "গাইব মা বীররসে ভাসি মহাগীত"—এই সংকল্প ব্যক্ত করার পরও *মেঘনাদবধকাব্যে* বাঙালি স্বভাবের অনুকূল করুণ রসের ধারা বইয়ে দিয়েছিলেন। ঐতিহাসিক নাটকে বীররস একটি অনুপম উপাদান। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ঐতিহাসিক নাটকের চরিত্রগুলোর মধ্যে কথা ও আচরণে দৃপ্ত, সমুন্নত পৌরুষ ও শৌর্যের সৌন্দর্য দেখা যায়, যা ট্র্যাজেডির চরিত্রসমূহের একটি অনবদ্য লক্ষণ।

এছাড়া তাঁর ওজস্বী, বীরত্বব্যঞ্জক, কবিত্বমণ্ডিত, ধারালো সংলাপ রচনার পারদর্শিতা ট্র্যাজিক নাটকের চরিত্রগুলোকে দান করেছে এক উন্নত স্বতন্ত্র মহিমা:

> 'জাহানারা : উঠুন, দলিত ভুজঙ্গের মতো ফণা বিস্তার করে উঠুন; হৃত শাবক ব্যাঘ্রীর মতো প্রমত্ত বিক্রমে গর্জে উঠুন; অত্যাচারে ক্ষিপ্ত জাতির মতো জেগে উঠুন। নিবৃত্তির মতো কঠিন হৌন; হিংসার মতো অন্ধ হৌন; শয়তানের মতো ক্রূর হৌন। তবে তার সঙ্গে পারবেন।'

সে-সময়কার বাংলা নাটকের বিনোদনপ্রিয় দর্শক ঠিক ট্র্যাজিক রসের যোগ্যগ্রহীতা ছিল না। বিশাল বা মহৎ চরিত্রের শোচনীয় পতনের মধ্যদিয়ে যে-করুণা ও ভয়ের মোক্ষণ ঘটে—ট্র্যাজেডির এই চারিত্র তারা অভিজ্ঞতার অন্তর্গত করতে চাইত না। প্রথম দিককার শখের নাট্যমঞ্চগুলো ও ব্যক্তি-পৃষ্ঠপোষকতামূলক মঞ্চগুলো 'শেক্সপিয়রের অনুবাদ' বা এজাতীয় রুচিশীল নাটক পরিবেশন করলেও ইংরেজিশিক্ষিত, আমন্ত্রিত ভদ্রলোকরাই ছিল তার দর্শক। পরবর্তীতে বাণিজ্যিক থিয়েটারের প্রসার ঘটলে, সাধারণ দর্শকরা মূলত বিনোদনের খোঁজেই রঙ্গমঞ্চে হাজিরা দিত—শিল্পের প্রয়োজনে নয়। ট্র্যাজেডি বলতে তারা বুঝত করুণ-রসের ছড়াছড়ি, মৃত্যুর ঘনঘটা ও নায়কনায়িকার বিচ্ছেদ। এই বিচ্ছেদও তাদের পক্ষে অসহনীয় ছিল। এখনকার বাংলা সিনেমার দর্শকদের মতো তারা নায়কপক্ষের সকল কলাকুশলীর হাস্যোজ্জ্বল গ্রুপ ছবি দেখে প্রসন্নচিত্তে গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে চাইত। তাদের মনোরঞ্জনের জন্যে অনেক ক্ষেত্রেই নায়কনায়িকার মৃত্যুদৃশ্যের পর আবার 'মেলতা বা মিলন দৃশ্য' সংযোজিত হত। এই দৃশ্যে হয়তো দেখানো হত মৃত্যুর পর স্বর্গধামে পরী-পরিবেষ্টিত হয়ে তারা মহাসুখে দোলনায় দোল খাচ্ছে।

এই পর্যায়ের দর্শকসাধারণের মধ্যে ক্রমান্বয়ে ট্র্যাজেডিকে প্রসারিত ও গ্রহণযোগ্য করা—এক বিশাল উত্তরণই বটে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের *সাজাহান* সেই যুগ-উত্তরণের একটি উজ্জ্বল সাক্ষ্য।

সাজাহান নাটকের ঐতিহাসিক পটভূমি

দ্বিজেন্দ্রলাল *সাজাহান* নাটকটি লিখতে গিয়ে যতদূর সম্ভব ইতিহাসের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে চেষ্টা করেছেন। ফরাসি পর্যটক ও বাদশাহ্ উরঙ্গজেবের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ফ্রাসোয়া বার্নিয়ের-এর ভ্রমণকাহিনী থেকে বেশিরভাগ ঐতিহাসিক তথ্যাদি গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া নাট্যকার ট্যাভার্নিয়ে, টড, মনুচীর ভারত-বৃত্তান্ত থেকেও ঘটনা ও চরিত্রচিত্রণে প্রভূত সহায়তা নিয়েছেন।

মোগল সম্রাট সাজাহান (১৬২৮-১৬৫৮) তার তিরিশবছর রাজত্বকালের শেষপর্যায়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। পিতার আসন্ন মৃত্যুর কথা চিন্তা করে তাঁর চার পুত্রের মধ্যে দিল্লির রাজসিংহাসন অধিকারকে কেন্দ্র করে ভাইয়ে ভাইয়ে লোভ, ষড়যন্ত্র ও ঈর্ষার আগুন জ্বলে ওঠে। পাঁচ বছর (১৬৫৫-১৬৬১) ধরে গৃহযুদ্ধ চলেছিল। যুদ্ধের শেষে উরঙ্গজেব ভ্রাতৃহত্যা ও পিতাকে কারারুদ্ধ করার মাধ্যমে বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন।

হিন্দুস্থানের তখত দখল নিয়ে গৃহবিবাদের সময় যে জটিল ও মারাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে, তারই ফলশ্রুতিতে যে ঐতিহাসিক ও পারিবারিক ট্র্যাজেডি সংঘটিত হয়, তাকে কেন্দ্র করেই *সাজাহান* নাটকটি রচিত হয়েছে।

নামকরণ নিয়ে মতপার্থক্য

সাজাহান নাটকের নামকরণ নিয়ে সমালোচকদের বিস্তর মতপার্থক্য রয়েছে। এটি যে একটি উৎকৃষ্ট ও সার্থক ট্র্যাজেডি এই বিষয়ে তাঁরা কেউ সন্দিহান নন; তবে এটি কার বা কোন্ চরিত্রটির ট্র্যাজেডি এ-ব্যাপারে তাদের কৌতূহলোদ্দীপক মতামতগুলোর ভিন্নতা দেখার মতো।

দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনীকার নবকৃষ্ণ ঘোষ সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্র দারার মৃত্যুকে সবচেয়ে বেশি শোকাবহ ঘটনা বলে বর্ণনা করেছেন :

> সাজাহান বিদ্রোহের পূর্বে যে-অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থাতেই আগ্রার দুর্গপ্রাসাদে ভোগসুখে রহিলেন। দারাই সিংহাসন ও জীবন দুইই হারাইলেন।

ড. সুকুমার সেনও *সাজাহান* নাটকের নামকরণের বিরোধিতা করেছেন। তাঁর মতে নাটকটির নাম 'জাহানারা' হওয়া উচিত ছিল :

> ...সাজাহানের ভূমিকা নিষ্ক্রিয় সাক্ষীর। জাহানারা সর্বাপেক্ষা স্ফুট ও বলিষ্ঠ ভূমিকা।... নাটকটির নাম জাহানারা হইলে বোধ হয় ঠিক হইত।

ড. অজিতকুমার ঘোষ আবার ঔরংজেবের পক্ষে রায় দিয়েছেন :

প্রকৃতপক্ষে যিনি কাহিনীর মধ্যস্থলে বিরাজ করিয়া সমস্ত চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ ও নিয়মিত করিতেছেন, তিনি ঔরংজীব।

রথীন্দ্রনাথ রায় অবশ্য তাঁর বলিষ্ঠ কলম চালনার মধ্য দিয়ে অন্যান্য সমালোচকের যুক্তি নস্যাৎ করেছেন এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নামকরণ-সম্পর্কিত সিদ্ধান্তকেই জোরালোভাবে সমর্থন করেছেন :

> কিন্তু দারার দুর্ভাগ্য বৃদ্ধ সাজাহানের ট্র্যাজেডিকেই গভীরতর ও বিস্তৃততর করে তুলেছে।... দারার পরিণতির মধ্যে কোনো অন্তর্দ্বন্দ্বসম্ভূত বেদনা নেই—

> তার চরিত্রে ট্র্যাজেডির নায়কোচিত কোনো ঘাত-প্রতিঘাত নেই।
>
> সাজাহান নাটকে ব্যক্তিত্বের বলিষ্ঠতায়, নির্ভীকতায়, সেবাপরায়ণতায় জাহানারা চরিত্রটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু জাহানারা কেন্দ্রীয় চরিত্র ও নায়িকা নন। তাছাড়া নাটকটি জাহানারার সুখ-দুর্ভাগ্যকে কেন্দ্র করেও রচিত হয়নি।...শুধু 'স্ফুট' ও 'বলিষ্ঠ' চরিত্র হিসেবেই জাহানারার দাবি স্বীকার করা সঙ্গত নয়।
>
> ... কাহিনীর মধ্যে প্রথম গতিসঞ্চার করেছেন সাজাহান, ঔরংজীব নন। নিরুপায় হয়েই অগত্যা সাজাহান তাঁর বিদ্রোহী পুত্রদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন। এর ফলে যে-চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল, ঔরংজীব তার কার্যক্রমের দ্বারা তাকেই আরো দ্রুত করে তুলেছেন।

বাংলাসাহিত্যের শক্তিমান ও প্রাজ্ঞ সমালোচকদের কাছে এই নাটকটির ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র-যে মূল চরিত্র মনে হয়েছে—এতে কিন্তু একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে ওঠে। তা হচ্ছে নাট্যকারের বলিষ্ঠ চরিত্রনির্মাণের সহজাত ক্ষমতা। একটি নাটকে এতগুলো জীবন্ত ও শক্তিমান চরিত্রের উপস্থিতি সত্যিই গৌরবের বিষয়।

সাজাহান নাটকের ট্র্যাজেডি বিচার ও তার শৈল্পিক পর্যালোচনা

সাজাহান নাটকটিকে শেক্সপিয়রের *কিংলিয়র*-এর সাথে তুলনা করা হয়। কারণ সম্রাট সাজাহান লিয়রের মতোই জরাগ্রস্ত, সন্তান কর্তৃক প্রবঞ্চিত এবং দুটিই Passive চরিত্র। ট্র্যাজেডির দর্শকরা যে-দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ, উষ্ণ কর্মময় নায়ক চরিত্রের সাথে পরিচিত; এরা তা নয়। তাদের জীবনে সক্রিয় বহির্দ্বন্দ্বের তুলনায় আত্মবিধ্বংসী অন্তর্দ্বন্দ্বই ক্রিয়াশীল। তাদের পতনের জন্য দায়ী অংশত তাদের অদৃষ্ট এবং অংশত তাদের স্বভাবগত ত্রুটি। *কিংলিয়র* এবং *সাজাহান* উভয়ের মধ্যেই দর্শক প্রত্যক্ষ করে বিশাল ক্ষমতাবান মানুষের করুণ বিপর্যয় এবং তাদের আলোড়িত ভেঙে-যাওয়া হৃদয়ের উন্মাদ আর্তনাদ। এই দুটি নাটককে তাই Tragedy of suffering-এর অন্তর্গত করা চলে।

তবে এ দুটি চরিত্রের মধ্যে পার্থক্যও কম নয়। *কিংলিয়র* একটি পৌরাণিক কল্পিত চরিত্র আর *সাজাহান* সুপরিচিত ইতিহাসের একটি বিখ্যাত বাস্তব চরিত্র। লিয়রের ট্র্যাজেডির কারণ তার অবিবেচনা আর সাজাহানের ট্র্যাজেডির কারণ তার অপরিমেয় স্নেহ। দুর্বলতা হিসেবে স্নেহ-যে অপেক্ষাকৃত নির্দোষ—এ-কথা পাঠক নিশ্চয়ই মানবেন। সাজাহানের পাপের চেয়ে তার দুর্ভাগ্যের কঠোরতাই বেশি।

কিংলিয়র নাটকে ট্র্যাজেডির মূল নায়ক আসলে কে—এই নিয়ে বিতর্ক ঘনীভূত হয়নি। কারণ, লিয়রের প্রতিপক্ষ কিংবা স্বপক্ষ হিসেবে যেসব চরিত্র আছে, তাদের মধ্যে তার চেয়ে সৎ ও বিবেচক চরিত্র থাকলেও; তার মতো বৈভব ও বিশালত্ব অন্য কারো নেই।

অন্যদিকে *সাজাহান* নাটকে সম্রাটের প্রতিপক্ষ ও সহযোগী হিসেবে যেসব চরিত্র ক্রিয়াশীল তারা প্রবলভাবে উজ্জ্বল ও দ্যুতিময় এবং একই সাথে স্ব স্ব কর্ম কিংবা নিয়তির নিষ্ঠুর পীড়নের শিকার। তাই *সাজাহান* নাটকের নায়ক চরিত্র নিয়ে বির্তকের ঘূর্ণি তৈরি হয়েছে এবং একই সাথে নাটকটি অনন্য মৌলিকতা লাভ করেছে।

সাজাহান নাটকটি সাজাহানেরই ট্র্যাজেডি। নাটকটি পড়ার সময় নাটকের ভেতরে বন্দি সাজাহানের কর্মময় জগৎকে পাঠক দেখতে পায় না ঠিকই কিন্তু তাজমহলের নির্মাতা ও ভারতবর্ষের একদা সম্রাট সাজাহানের প্রবল প্রভাব ও প্রতিপত্তি তাদের স্মরণে সবসময়ই ক্রিয়াশীল থাকে। তাই তার শোচনীয় পরিণতি পাঠককে বিশাল মানুষের দুর্ভাগ্য অবলোকন করার অনুভূতিই এনে দেয়।

ঔরংগজেব চরিত্র নাটকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্রিয়াশীল হওয়া সত্ত্বেও তার দুষ্কৃতিগুলো তাকে মহৎ-চরিত্রের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করে রাখে। ট্র্যাজেডির নায়ক তার ভুলের জন্য শাস্তি পায়; কিন্তু ঔরংগজেব যা করেছে তা ভুল নয়; অপরাধ।

দারা সততা, জ্ঞান, সাহস সবধরনের সদ্‌গুণে ভূষিত এবং তাঁর মৃত্যু ভয়ঙ্কর হলেও, তাঁর চরিত্রে দ্বন্দ্ব নেই। তিনি একজন জনপ্রিয় রাজপুত্র বটে, তবে তাঁর কর্মজগৎ যা তাকে মহত্ত্ব এনে দেবে—তা রয়েছে ভবিষ্যতের গর্ভে, কারণ তিনি একজন তরুণ মাত্র। নাটকের প্রথম থেকেই দর্শক দেখছে তিনি ঔরংগজেবের ষড়যন্ত্রের কাছে বারংবার পরাভূত হচ্ছেন। সবকিছু মিলিয়ে তার চরিত্র ঠিক ট্র্যাজিক নাটকের নায়কের মহিমায় উদ্ভাসিত হয়নি।

সাজাহান নাটকের সাজাহান চরিত্রটিতে কর্তব্য বা শাসন ছাপিয়ে স্নেহময় রূপটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে :

> "আমি শুধু ভাবছি দারা, যে, এ-যুদ্ধে যে-পক্ষেরই পরাজয় হয়, আমার সমান ক্ষতি। এ-যুদ্ধে তুমি পরাজিত হলে আমায় তোমার ম্লান মুখখানি দেখতে হবে, আবার তারা পরাজিত হয়ে ফিরে গেলে তাদের ম্লান মুখ কল্পনা করতে হবে। কাজ নেই দারা। তারা রাজধানীতে আসুক; আমি তাদের বুঝিয়ে বলব।"

এ-ধরনের উক্তির যাথার্থ্য থাকলেও অনেক সময় তার স্নেহদৌর্বল্য বাড়াবাড়ি মনে হতে পারে :

> "কথা কস্ নে জাহানারা! পুত্র আমার পা জড়িয়ে আমার ক্ষমা ভিক্ষা চাচ্ছে। আমি কি তা না দিয়ে থাকতে পারি?"

John Dryden-এর Absalom and Achitophel-এ রাজা তার বিদ্রোহী পুত্রের উদ্দেশে তার স্নেহ প্রকাশ করেছেন এই বলে—

> "How easy 'tis for parents to forgive !
> With how few tears a pardon might be won
> From nature, pleading for a darling son!"

কিন্তু একই সাথে তিনি পুত্রকে তিরস্কার করেছেন এবং সংহত মস্তিষ্কে তার অন্যায় কাজের পর্যালোচনা করেছেন। কিন্তু সম্রাট সাজাহানের ভেতর এই স্নেহ ও শাসনের সুষম ভারসাম্য রক্ষিত হয়নি। ঔরংগজেবের প্রতি তার অভিমান-বিক্ষুব্ধ উক্তিগুলোতে আবেগময় কাব্যিক সৌন্দর্য প্রতিফলিত হয়েছে যা তাজমহলের স্বপ্নদ্রষ্টা, প্রেমিক সাজাহানেরই উপযুক্ত সংলাপ; কোনো কঠোর বিবেচক শাসকের নয় :

> 'পিতা, সব আর নিজে না-খেয়ে পুত্রদের খাইও না; বুকের ওপর রেখে ঘুম পাড়িও না; তাদের হাসিটি দেখার জন্য স্নেহের হাসি হেসো না। তাদের আধপেটা খাইয়ে মানুষ করো...তাদের সকালে বিকেলে জোরে কষাঘাত করো।'

মনোবিশ্লেষণের পরিভাষার দুটি শব্দ আছে— মাতৃভূমিকা (mother's position) ও পিতৃভূমিকা (father's position)। প্রথম ভূমিকাটি প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেয় ও দ্বিতীয় ভূমিকাটি প্রবৃত্তিকে শাসন করে। সমাজ ও আইন মানুষের জীবনে দ্বিতীয় ভূমিকাটি পালন করে। খলিফা ওমর তার ব্যভিচারী পুত্রকে শাস্তি দিয়ে দ্বিতীয় ভূমিকাটি পালন করেছিলেন। কিন্তু সম্রাট সাজাহান প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিয়ে 'মাতৃভূমিকা'ই গ্রহণ করেছেন। তার আহত যন্ত্রণাকাতর আত্মার ক্রন্দনই তাঁর চরিত্রকে ট্র্যাজিক মহিমা দিয়েছে; দ্বৈত সত্তার দ্বন্দ্ব নয়।

ঔরংগজেব ইতিহাসের একটি জটিল রহস্যময় চরিত্র। দারা তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কাছে প্রায়ই বলতেন যে তাঁর সব ভাইয়ের মধ্যে ঐ 'নামাজী' ভাইটিকে নিয়েই তাঁর দুশ্চিন্তা বেশি (বার্নিয়েরের ভ্রমণকাহিনী অনুসারে)। ধর্মের প্রতি তাঁর সত্যসত্যই অনুরাগ অকৃত্রিম ছিল। শুধু ধর্ম নয়; প্রজা, রাষ্ট্রের শাসন, রাজার কর্তব্য প্রভৃতি নিয়ে তাঁর যে গভীর পড়াশোনা ও ভাবনা তা সত্যিই বিস্ময়কর এবং দুর্লভ। তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত পত্রগুলোতে কবিতা, প্রাচীন শ্লোক ও ধার্মিক, মহৎ মানুষদের সম্বন্ধে তাঁর অগাধ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি নিজে পিতার প্রতি নিষ্ঠুর হলেও পুত্রদের খুব ভালোবাসতেন এবং তাঁদের সুশাসক করে গড়ে তুলতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রকে লেখা একটি পত্রে তিনি আক্ষেপ করেছেন :

উন্নতপুত্র, যদিও যুবক পুত্র (আযম) বৃদ্ধ পিতাকে ভালোবাসে না, তথাপি বৃদ্ধ পিতা তার যুবক পুত্রকে ভালোবাসে। *(আওরঙ্গজেবের পত্রাবলী)*

ভালোবাসা সত্যিই নিম্নগামী!

ইউরোপে রাজার বড়ছেলে যেহেতু সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসেবে নির্ধারিত থাকে তাই সিংহাসনের অধিকার নিয়ে এত রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয় না। কিন্তু ভারতবর্ষে এ-ধরনের কোনো আইন প্রতিষ্ঠিত না-থাকায় রাজত্বের অধিকার নিয়ে ভ্রাতৃকলহের সৃষ্টি হত। কারণ সিংহাসনের অধিকার হারালে পদানত, করুণ জীবনযাপন করাই নিয়তি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে ঔরংগজেবের তখ্‌ত দখলকে অতটা নারকীয় মনে হয় না। ভোগসুখের প্রতি সুজা ও মুরাদের মতো তাঁর আকর্ষণ ছিল না। তাঁর লক্ষ্য ছিল মূলত ক্ষমতা কিংবা ভারতবর্ষে ইসলামধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার দিকে। অবশ্য তাঁর শেষোক্ত লক্ষ্য এবং পরধর্ম-বিদ্বেষ তাঁর সুশাসনকে ব্যর্থ করে দিয়েছে অনেকাংশে; হিন্দুদের মধ্যে অসন্তোষের জন্ম দিয়েছে।

যত যাই হোক, ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্যে হলেও ভ্রাতৃহত্যা কোনো ধর্ম অনুমোদন করে না, মানবধর্ম তো নয়ই। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর *সাজাহান* নাটকে ট্র্যাজেডি দেখিয়েছেন এই মানবধর্ম ক্ষুণ্ন হওয়ার ঘটনাবলিকে কেন্দ্র করে। রাজসিংহ আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে-মন্তব্য করেছেন তা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় :

> "সাধারণ ইতিহাসের একটা গৌরব আছে। কিন্তু স্বতন্ত্র মানবজীবনের মহিমাও তদপেক্ষা ন্যূন নহে। ইতিহাসের উচ্চচূড় রথ চলিয়াছে। বিস্মিত হইয়া দেখো, সমবেত হইয়া মাতিয়া উঠো, কিন্তু সেই রথচক্রতলে যদি একটি মানবহৃদয় পিষ্ট হইয়া ক্রন্দন করিয়া মরিয়া যায় তবে তাহার সেই মর্মান্তিক আর্তধ্বনিও, রথের চূড়া যে গগনতল স্পর্শ করিতে স্পর্ধা করিতেছে, সেই গগনপথে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, হয়তো সেই রথচূড়া ছাড়াইয়া চলিয়া যায়।"

প্রেম ও যুদ্ধের কোনো নির্দিষ্ট ন্যায়নীতি নাই বলা হলেও এ দুটি যেহেতু মানবসমাজের অন্তর্ভুক্ত বিষয় তাই অবশ্যই তারাও কিছু নিয়মনীতির অধীন। যেমন : প্রকৃত যোদ্ধা রাত্রে সৈন্যশিবির আক্রমণ করেন না। সন্ধির আলোচনা চলাকালীন হঠাৎ বিশ্বাসঘাতকতা করে শত্রুশিবির ধ্বংস অভিযান পরিচালনা করেন না।

শ্রীকৃষ্ণ প্ররোচিত অর্জুন অন্যায়যুদ্ধে কর্ণকে বধ করেছিলেন। কর্ণ ভূমিতে নিমজ্জিত রথের চাকা উত্তোলনের জন্য অল্পকিছু সময় প্রার্থনা করেছিলেন। সে-সময় তাঁকে দেওয়া হয়নি। তাঁর প্রাণরক্ষাকারী কবচ কুণ্ডলীও ঘৃণিত কৌশলে তাঁর কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

ঔরংগজীব নিজের জয় সুনিশ্চিত করার জন্য এ জাতীয় এমন কোনো ম্যাকিয়াভ্যালিয়ান পথ নেই—যা অবলম্বন করেননি। অন্তত *সাজাহান* নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল তাই দেখিয়েছেন। অন্যদিকে যোধপুরপতি মহারাজ যশোবন্ত সিং ঔরঙ্গজেবের বিপরীত ধারার একজন যোদ্ধা :

> "ঔরংজীব : রাজপুত দর্প! এই দর্পই মহারাজের পরাজয়ের কারণ। আমি সসৈন্যে নর্মদাতীরে উপস্থিত হওয়া মাত্রই যদি তিনি আমায় আক্রমণ করতেন আমার পরাজয় অনিবার্য ছিল। কারণ তুমি (পুত্র মহম্মদ) তখন এসে উপস্থিত হওনি, আর আমার সৈন্যরাও পথশ্রান্ত ছিল; কিন্তু শুনলাম এরূপ আক্রমণ করা বীরোচিত নয় বলে মহারাজ তোমার আগমনের অপেক্ষা করছিলেন। অতি দর্পে পতন হবেই।"

আর তার উপযুক্ত পত্নী মহামায়া রাজপুত-রক্তের উষ্ণতায় পরাজিত যোদ্ধা স্বামীকে গ্রহণ করতে চাননি। এর বর্ণনা টড, বার্নিয়ের, মনুচী সব ঐতিহাসিকই দিয়েছেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের *ঔরঙ্গজেব* তার সকল বৈরাগ্যের ভান ও ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও পুরোপুরি কুটিল চরিত্র নয়। নর্মদা যুদ্ধক্ষেত্রে যশোবন্ত সিংহ ঔরঙ্গজেবের নির্ভীক বীরত্বের কথা স্মরণ করেছেন। ঔরঙ্গজেব নিজে জটিল হলেও তার পুত্র মহম্মদের সরল প্রকৃতিকে ভালোবেসেছেন। দারার পুত্র সোলেমানকে তিনি তার প্রাণরক্ষার সুযোগ দিয়েছেন এবং তার মহত্ত্বকে সম্মান করেছেন। দারার প্রহসন-বিচার সংঘটিত করার আগে ঔরংঙ্গজেবের মধ্যে দ্বিধা ও বিবেকের জাগরণ দেখা গেছে :

> "শায়েস্তা : ঔরংজীব। তবে তোমারও বিবেক আছে?"

এবং শেষ দৃশ্যে যখন তিনি জানু পেতে তার বৃদ্ধ পিতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছেন, তখন তার চরিত্রের মানবিক দিকটি হঠাৎ ঔজ্জ্বল্য নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

এই নাটকের প্রায় প্রতিটি চরিত্র স্বীয় বৈশিষ্ট্যে ঝকমক করছে। পরিহাসপ্রিয় ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির অধিকারী 'দিলদার'-এ Shakespeare-এর 'Fool' চরিত্রের প্রভাব সত্ত্বেও তার মধ্যে একটি মৌলিক আকর্ষণের শক্তি রয়েছে :

> "এই-যে দেখুন উজিরসাহেব, হিন্দু মুসলমান, এদের কী মেসো? প্রথমত ভগবানের দান যে এ চেহারাখানা, টেনেটুনে যতখানি আলাদা করা যায় তা তারা করেছে। এরা রাখে দাড়ি সম্মুখে, ওরা রাখে টিকি পিছনে [তা-ও সম্মুখে রাখবে না]। এরা পশ্চিমে মুখ ফিরিয়ে নেওয়াজ পড়ে, ওরা পূর্বদিকে মুখ ফিরিয়ে প্রার্থনা করে। এরা কাছা দেয় না, ওরা দেয়। এরা লেখে ডানদিক থেকে বাঁয়ে ওরা লেখে বাঁয়ে থেকে ডাইনে—লেখে না!

মীরজুমলা। হাঁ, তাই কি?

দিলদার। তবু হিন্দুরা মুসলমানের অধীনে একরকম সুখে আছে বলতে হবে; কিন্তু ভাই ভাইয়ের প্রভুত্ব স্বীকার করবে না।

[মীরজুমলা হাসিলেন]"

ঔরঙ্গজেবের পুত্র মহম্মদ এবং দারার পুত্র সোলেমান দুজনই তারুণ্য, সততা, সৌন্দর্যে নাটকটিকে মূল্যবান করেছে।

সাজাহান নাটকে রণদামামাই উচ্চকিত। তবে এরই মধ্যে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করেছে প্রেমের সৌন্দর্যময় জগৎ। সুজা ও পিয়ারী; দারা ও নাদিয়া; যশোবন্ত ও মহামায়া—এই তিনটি দম্পতির সম্পর্কের ভেতরে ভালোবাসা বিচিত্র বিভঙ্গে সুবর্ণরেখার ক্ষিপ্রতায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল আবেগময় উক্তি রচনায় দক্ষ হলেও একাধিক নন্দিত প্রহসনের রচয়িতা দ্বিজেন্দ্রলাল বিরহ নিয়ে অতি-আবেগের বাড়াবাড়িতে সম্ভবত অস্বস্তিবোধ করেন ও তা নিয়ে সুযোগ পেলেই বিদ্রূপ করেন। তিনি প্রকৃত আবেগ, নিরাবেগ, অতি-আবেগ, ছদ্ম-আবেগ প্রভৃতি সমৃদ্ধ সব ধরনের সংলাপ রচনাতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। পরিহাসপ্রিয়, তীক্ষ্ণধী, গীতপটু পিয়ারা ও শাহজাদা সুজার কথোপকথন থেকে যার কিছুটা আভাস পাওয়া যায় :

"পিয়ারা। ...তোমার প্রেমের কারাগারে আমি বন্দিনী। তুমি আমার প্রভু, আমি তোমার ক্রীতদাসী—কী আজ্ঞা হয়? (জানু পাতিলেন)

সুজা। এ একটা বেশ নতুন রকমের ঢং করেছ তো পিয়ারা। আচ্ছা যাও বন্দিনী, আমি তোমায় মুক্ত করে দিলাম।

পিয়ারা। আমি মুক্তি চাই না। এ আমার মধুর দাসত্ব।"

* * *

"পিয়ারা। তোমার বাসনাপুষ্পগুলি প্রেমচন্দন মাখিয়ে নাও— তারপরে আমি গান গাই—আর তুমি তোমার সেই পুষ্পগুলি আমার চরণে দান করো!

সুজা। হাঃ! হাঃ! হাঃ! তুমি বেশ বলেছ—যদিও আমি তোমার উপমার ঠিক রসগ্রহণ করতে পারলাম না।"

পিয়ারা জানত ইতিহাসের যে রক্তপিপাসু মঞ্চে সুজার জন্য সেখানে ক্রমাগত যুদ্ধ থেকে যুদ্ধের ভেতর পথপরিক্রমা শেষে চরম পরিণতি বরণ করাই হবে তার নিয়তি। তাই ক্রমাগত গীত, পরিহাসের মধ্যদিয়ে সে এক সুখের বৃত্ত তৈরি করে আসন্ন দুঃখকে ভুলে থাকতে চাইত।

দারার কন্যা জহরৎ তার পিতৃহন্তা ঔরঙ্গজেবকে তুমুল ঘৃণা করত। তার নিষ্ক্রিয় নারীজন্ম নিয়ে সে অসন্তুষ্ট ছিল। একবার সে বাদশাহ ঔরঙ্গজেবকে ছোরা মারতেও উদ্যত হয়। তবু নাটকটির বর্ণাঢ্য জগতে সে ছিল নিতান্তই একটি গৌণ চরিত্র।

কিন্তু শেষ দৃশ্যে তার প্রচণ্ড শক্তিশালী আবির্ভাব ঘটে। শেষ দৃশ্যটিতে ঔরঙ্গজেব তার পিতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে এসেছেন। দুঃখবিধ্বস্ত সাজাহান প্রথমত

তাকে দেখে তীব্র ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেন। পরে তার ক্রোধ প্রশমিত হয় ও ঔরঙ্গজেবের প্রার্থনায় তার হৃদয় দ্রবীভূত হয়। কিন্তু জাহানারা তাকে ক্রমাগত বিদ্রূপ ও বক্রোক্তিতে বিদ্ধ করতে থাকেন। তবে বিস্ময়করভাবে শেষপর্যায়ে প্রবল ঔরঙ্গজেব-বিরোধী জাহানারা বৃদ্ধ পিতার অনুরোধে তার ক্ষমা প্রার্থনা মঞ্জুর করেন।

> "জাহানারা। ঔরংজীব এখানে তোমার জয় সম্পূর্ণ হল। ঔরংজীব আমার এই জীর্ণ মুমূর্ষু পিতার অনুরোধে আমি তোমায় ক্ষমা করলাম। [মুখ ঢাকিলেন]"

নাটকটির এই পর্যায়ে এর তীব্র নাট্যদ্বন্দ্ব ও উত্তেজনা আকস্মিকভাবে প্রশমিত হয়। বিস্মিত হলেও দর্শক ও পাঠকদের হৃদয়ে একটি অবসিত ভাব ও শান্ত স্থিতি নামে।

কিন্তু তাদের জন্য আরেকটি বিপরীত ভাবের সংঘাত অপেক্ষা করেছিল। দারার কন্যা হঠাৎ তীব্র বিচ্ছুরিত ঘৃণায় জ্বলে উঠে *ঔরঙ্গজেবকে* অভিশাপ দেয়—

> "জহরৎ। কিন্তু আমি ক্ষমা করি নাই ঘাতক! পৃথিবী সুদ্ধ যদি তোমায় ক্ষমা করে, আমি করব না। আমি তোমায় অভিশাপ দিচ্ছি। ক্রুদ্ধ ফণিনীর উষ্ণ নিশ্বাসে আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি।... তুমি আমার পিতাকে হত্যা করে, যে সাম্রাজ্য অধিকার করেছ, আমি অভিশাপ দেই, যেন তুমি দীর্ঘকাল বাঁচো, আর সেই সাম্রাজ্য ভোগ করো; যেন সেই সাম্রাজ্য তোমার কালস্বরূপ হয়; যেন সে পাপ থেকে কেবল গাঢ়তর পাপে তোমায় নিক্ষেপ করে, যাতে মরবার সময় তোমার ঐ উত্তপ্ত ললাটে ঈশ্বরের করুণার এক কণাও না পাও।
>
> [সাজাহান, ঔরংজীব ও জাহানারা তিনজনই শির অবনত করিলেন]"

এই নাটকটির আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে এর গতিময়তা। নাট্যকার সযত্নে অতিদীর্ঘ বাক্য এড়িয়ে গেছেন। ঘটনা ও সংলাপ দ্রুততালে পাঠকের কৌতূহলকে সজাগ রেখে এগিয়ে গেছে।

কোনো বইয়ের পাতার ভাঁজে যদি ঘাসফুল কিংবা নান্দনিক নকশার কোনো পাতা রাখা থাকে, তবে সেই বইটি পড়তে গিয়ে সেই ফুল বা পাতা অসাবধানে খসে পড়তে পারে। *সাজাহান* নাটকটির পাতার ভাঁজে ভাঁজে এমনই সৌন্দর্যময় অজস্র শিল্পের ফুল লুকিয়ে আছে; যা পড়ার সময় ঝিলিক দিয়ে উঠে পাঠকের হৃদয়ের ভেতর খসে পড়ে।

নিঃসন্দেহে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের *সাজাহান* নাটকটি বাংলা সাহিত্যের একটি চিরউজ্জ্বল সম্পদ।

নাহিদ আহসান
এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা

পুরুষ-চরিত্র

সাজাহান (ভারতবর্ষের সম্রাট)। দারা, সুজা, ঔরংজীব, মোরাদ (সাজাহানের পুত্রচতুষ্টয়)। সোলেমান, সিপার (দারার পুত্রদ্বয়)। মহম্মদ সুলতান (ঔরংজীবের পুত্র)। জয়সিংহ (জয়পুরপতি)। যশোবন্ত সিংহ (যোধপুরপতি)। দিলদার (ছদ্মবেশী জ্ঞানী—দানেশমন্দ)।

স্ত্রী-চরিত্র

জাহানারা (সাজাহানের কন্যা)। নাদিরা (দারার স্ত্রী)। পিয়ারা (সুজার স্ত্রী)। জহরৎ উন্নিসা (দারার কন্যা)। মহামায়া (যশোবন্ত সিংহের স্ত্রী)।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—আগ্রার দুর্গপ্রাসাদ; সাজাহানের কক্ষ।
কাল—অপরাহ্ণ।

সাজাহান শয্যার উপর অর্ধশায়িত অবস্থায় কর্ণমূল করতলে ন্যস্ত করিয়া অধোমুখে ভাবিতেছিলেন ও মধ্যে মধ্যে একটি আলবোলা টানিতেছিলেন। সম্মুখে দারা দণ্ডায়মান।

সাজাহান। তাই তো ! এ বড় দুঃসংবাদ দারা!

দারা। সুজা বঙ্গদেশে বিদ্রোহ করেছে বটে কিন্তু সে এখনও সম্রাট নাম নেয়নি; কিন্তু মোরাদ, গুর্জরে সম্রাট নাম নিয়ে বসেছে, আর দাক্ষিণাত্য থেকে ঔরংজীব তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

সাজাহান। ঔরংজীব তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে—দেখি, ভেবে দেখি—এরকম কখনও ভাবিনি, অভ্যস্ত নই; তাই ঠিক ধারণা করতে পারছি না—তাই তো! [ধূমপান]

দারা। আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

সাজাহান। আমিও পারছি না। [ধূমপান]

দারা। আমি এলাহাবাদে আমার পুত্র সোলেমানকে সুজার বিরুদ্ধে যাত্রা করবার জন্য লিখছি, আর তার সঙ্গে বিকানীরের মহারাজ জয়সিংহ আর সৈন্যাধ্যক্ষ দিলীর খাঁকে পাঠাচ্ছি।

[সাজাহান আনত চক্ষে ধূমপান করিতে লাগিলেন]

দারা। আর মোরাদের বিরুদ্ধে আমি মহারাজ যশোবন্ত সিংহকে পাঠাচ্ছি।

সাজাহান। পাঠাচ্ছ! তাই তো! [ধূমপান]

দারা। পিতা, আপনি চিন্তিত হবেন না। এ বিদ্রোহ দমন করতে আমি জানি।

সাজাহান। না, আমি তার জন্য ভাবছি না দারা; তবে এই—ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ—তাই ভাবছি। [ধূমপান; পরে সহসা] না—দারা, কাজ নেই। আমি তাদের বুঝিয়ে বলব। কাজ নেই। তাদের নির্বিরোধে রাজধানীতে আসতে দাও।

বেগে জাহানারার প্রবেশ

জাহানারা। কখনও না। এ হতে পারে না পিতা। প্রজা রাজার উপর খড়্গ তুলেছে, সে খড়্গ তার নিজের স্কন্ধে পড়ুক।

সাজাহান। সে কী জাহানারা! তারা আমার পুত্র।

জাহানারা। হোক পুত্র। কী যায় আসে। পুত্র কি কেবল পিতার স্নেহের অধিকারী? পুত্রকে পিতার শাসনও করতে হবে!

সাজাহান। আমার হৃদয় শুধু এক শাসন জানে। সে শুধু স্নেহের শাসন! বেচারি মাতৃহারা পুত্রকন্যারা আমার! তাদের শাসন করব কোন্ প্রাণে জাহানারা! ঐ চেয়ে দেখ্—ঐ স্ফটিক গঠিত [দীর্ঘনিশ্বাস]—ঐ তাজমহলের দিকে চেয়ে দেখ্—তার পর বলিস তাদের শাসন করতে।

জাহানারা। পিতা, এই কি আপনার উপযুক্ত কথা! এই দৌর্বল্য কি ভারত-সম্রাট সাজাহানকে সাজে! সাম্রাজ্য কি অন্তঃপুর! একটা ছেলেখেলা! একটা প্রকাণ্ড শাসনের ভার আপনার উপর। প্রজা বিদ্রোহী হলে সম্রাট কি তাকে পুত্র বলে ক্ষমা করবেন? স্নেহ কি কর্তব্যকে ছাপিয়ে উঠবে?

সাজাহান। তর্ক করিস না জাহানারা। আমার কোনো যুক্তি নাই! আমার কেবল এক যুক্তি আছে। সে স্নেহ। আমি শুধু ভাবছি দারা, যে, এ-যুদ্ধে যে-পক্ষেরই পরাজয় হয়, আমার সমান ক্ষতি। এ-যুদ্ধে তুমি পরাজিত হলে আমায় তোমার ম্লান-মুখখানি দেখতে হবে; আবার তারা পরাজিত হয়ে ফিরে গেলে তাদের ম্লান-মুখ কল্পনা করতে হবে। কাজ নেই দারা। তারা রাজধানীতে আসুক; আমি তাদের বুঝিয়ে বলব।

দারা। পিতা, তবে তাই হোক।

জাহানারা। দারা, তুমি কি এইরকম করে তোমার বৃদ্ধ পিতার প্রতিনিধির কাজ করবে! পিতা যদি স্বয়ং শাসনক্ষম হতেন, তাহলে তোমার হাতে তিনি রাজ্যের রশ্মি ছেড়ে দিতেন না। এই উদ্ধত সুজা, স্বকল্পিত সম্রাট মোরাদ, আর তার সহকারী ঔরংজীব বিদ্রোহের নিশান উড়িয়ে ডঙ্কা বাজিয়ে আগ্রায় প্রবেশ করবে, আর তুমি পিতার প্রতিনিধি হয়ে তাই সহাস্যমুখে দাঁড়িয়ে দেখবে?—উত্তম!

দারা। সত্য পিতা, এ কি হতে পারে? আমায় আজ্ঞা দিন পিতা।

সাজাহান। ঈশ্বর! পিতাদের এই বুকভরা স্নেহ দিয়েছিলে কেন? কেন তাদের হৃদয়কে লৌহ দিয়ে গড়োনি!—ওহ্!

দারা। ভাববেন না পিতা, যে, আমি এ সিংহাসনের প্রত্যাশী। তার জন্য যুদ্ধ নয়! আমি এ সাম্রাজ্য চাই না। আমি দর্শনে উপনিষদে এর চেয়ে বড় সাম্রাজ্য পেয়েছি। আমি যাচ্ছি আপনার সিংহাসন রক্ষা করতে।

জাহানারা। তুমি যাচ্ছ ন্যায়ের সিংহাসন রক্ষা করতে, দুষ্কৃতকে শাসন করতে, এই দেশের কোটি কোটি নিরীহ প্রজাদের অরাজক অত্যাচারের গ্রাস থেকে বাঁচাতে! যদি রাজ্যে এই দুষ্প্রবৃত্তি শৃঙ্খলিত না হয়, তবে এ মোগল-সাম্রাজ্যের পরমায়ু আর কয়দিন?

দারা। পিতা, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, ভাইদের কাউকে পীড়ন বা বধ করব না, তাদের বেঁধে পিতার পদতলে এনে দেব। পিতা তখন তাদের ইচ্ছা হয়, ক্ষমা করবেন! তারা জানুক, সম্রাট সাজাহান স্নেহশীল—কিন্তু দুর্বল নয়।

সাজাহান। [উঠিয়া] তবে তাই হোক্! তারা জানুক যে সাজাহান শুধু পিতা নয়— সাজাহান সম্রাট। যাও দারা! নাও এই পাঞ্জা। আমি আমার সমস্ত ক্ষমতা তোমায় দিলাম। বিদ্রোহীর শাস্তি বিধান করো। [পাঞ্জা প্রদান]

দারা। যে আজ্ঞা পিতা!

সাজাহান। কিন্তু এ শাস্তি তাদের একার নয়। এ শাস্তি আমারও। পিতা যখন পুত্রকে শাসন করে—পুত্র ভাবে যে, পিতা কী নিষ্ঠুর! সে জানে না যে পিতার উদ্যত বেত্রের অর্ধেকখানি পড়ে সেই পিতারই পৃষ্ঠে!

[প্রস্থান]

জাহানারা। তাদের এই হঠাৎ বিদ্রোহের কারণ কিছু অনুমান করেছ দারা?

দারা। তারা বলে যে পিতা রুগ্ণ এ-কথা মিথ্যা; পিতা মৃত, আর আমি নিজের আজ্ঞাই তার নামে চালাচ্ছি।

জাহানারা। তাতে অপরাধ কী হয়েছে? তুমি সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্র—ভাবী সম্রাট।

দারা। তারা আমাকে সম্রাট বলে মানতে চায় না।

সিপারের সহিত নাদিরার প্রবেশ।

সিপার। তারা তোমার হুকুম মানতে চায় না বাবা?

জাহানারা। দেখ তো আস্পর্ধা! [হাস্য]

দারা। কি নাদিরা, তুমি অধোমুখে যে? তুমি যেন কিছু বলবে!

নাদিরা। শুনবে প্রভু? আমার একটা অনুরোধ রাখবে!

দারা। তোমার কোন্ অনুরোধ কবে না-রেখেছি নাদিরা!

নাদিরা। তা জানি। তাই বলতে সাহস করছি। আমি বলি—তুমি এ-যুদ্ধ থেকে বিরত হও।

জাহানারা। সে কী নাদিরা!

নাদিরা। দিদি—

দারা। কী! বলতে বলতে চুপ করলে যে! কেন তুমি এ অনুরোধ করছ নাদিরা!

নাদিরা। কাল রাত্রে আমি একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি।

দারা। কী দুঃস্বপ্ন?

নাদিরা। আমি এখন তা বলতে পারব না। সে বড় ভয়ানক। না নাথ। এ-যুদ্ধে কাজ নেই—

দারা। সে কী নাদিরা!

জাহানারা। নাদিরা, তুমি পরভেজের কন্যা না? একটা যুদ্ধের ভয়ে এই অশ্রু, এই শঙ্কাকুল দৃষ্টি, এই ভয়বিহ্বল উক্তি তোমার শোভা পায় না।

নাদিরা। দিদি, যদি জানতে যে সে কী দুঃস্বপ্ন! সে বড় ভয়ানক, বড় ভয়ানক।

জাহানারা। দারা, এ কী! তুমি ভাবছ! এত তরল তুমি! এত স্ত্রৈণ! পিতার সম্মতি পেয়ে এখন স্ত্রীর সম্মতি নিতে হবে না কি! মনে রেখো দারা, কঠোর কর্তব্য সম্মুখে! আর ভাববার সময় নাই।

দারা। সত্য নাদিরা! এ যুদ্ধ অনিবার্য, আমি যাই। যথাযথ আজ্ঞা দেই গে যাই।

[প্রস্থান]

নাদিরা। এত নিষ্ঠুর তুমি দিদি—এসো সিপার।

[সিপারের সহিত নাদিরার প্রস্থান।]

জাহানারা। এত ভয়াকুল! কী কারণ বুঝি না।

সাজাহানের পুনঃপ্রবেশ

সাজাহান। দারা গিয়েছে জাহানারা?

জাহানারা। হাঁ বাবা!

সাজাহান। [ক্ষণিক নিস্তব্ধ থাকিয়া] জাহানারা—

জাহানারা। হাঁ বাবা!

সাজাহান। তুইও এর মধ্যে?

জাহানারা। কিসের মধ্যে?

সাজাহান। এই ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের?

জাহানারা। না বাবা—

সাজাহান। শোন্ জাহানারা। এ বড় নির্মম কাজ! কী করব—আজ তার প্রয়োজন হয়েছে! উপায় নাই; কিন্তু তুইও এর মধ্যে যাস্‌নে, তোর কাজ—স্নেহ-ভক্তি-অনুকম্পা। এ আবর্জনায় তুইও নামিসনে। তুই অন্তত পবিত্র থাক।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—নর্মদাতীরে মোরাদের শিবির।

কাল—রাত্রি

দিলদার একাকী

দিলদার। আমি মুখে মোরাদের বিদূষক। আমি হাস্য পরিহাস করতে যাই, সে ব্যঙ্গের ধুম হয়ে ওঠে! মূর্খ তা বুঝতে পারে না। আমার উক্তি অসংলগ্ন মনে করে হাসে। মোরাদ একদিকে যুদ্ধোন্মাদ, আর-একদিকে সম্ভোগ-মজ্জিত। মনোরাজ্য ওর কাছে একটা অনাবিষ্কৃত দেশ—এই-যে বর্বর এখানে আসছে।

মোরাদের প্রবেশ

মোরাদ। দিলদার! আমাদের যুদ্ধে জয় হয়েছে। আনন্দ করো, স্ফূর্তি করো। অচিরে পিতাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে আমি সেখানে বসছি!—কী ভাবছ দিলদার? ঘাড় নাড়ছ যে!

দিলদার। জাঁহাপনা, আমি আজ একটা তথ্য আবিষ্কার করেছি।

মোরাদ। কী? শুনি।

দিলদার। আমি শুনেছি যে, হিংস্র জন্তুদের মধ্যে একটা দস্তুর আছে যে, পিতা সন্তান খায়। আছে কি না?

মোরাদ। হ্যাঁ আছে। তাই কী?

দিলদার। কিন্তু সন্তান পিতা খায়, এ-প্রথাটা তাদের মধ্যে নেই বোধহয়।

মোরাদ। না।

দিলদার। হুঁ। সে-প্রথাটা কেবল মানুষের মধ্যেই দিয়েছেন। দু-রকমই চাই তো! খুব বুদ্ধি!

মোরাদ। খুব বুদ্ধি! হাঃ হাঃ হাঃ! বড় মজার কথা বলেছ দিলদার।

দিলদার। কিন্তু মানুষের যে-বুদ্ধি, তার কাছে ঈশ্বরের বুদ্ধি কিছুই নয়। মানুষ ঈশ্বরের উপর চাল চেলেছে।

মোরাদ। কী রকম?

দিলদার। এই দেখুন জাঁহাপনা, দয়াময় মানুষকে দাঁত দিয়েছিলেন কী জন্য? চর্বণ করবার জন্য নিশ্চয়, বাহির করবার জন্য নয়; কিন্তু মানুষ সে দাঁত দিয়ে চর্বণ তো করেই, তার উপর সেই দাঁত দিয়েই হাসে। ঈশ্বরের উপর চাল চেলেছে বলতে হবে।

মোরাদ। তা বলতে হবে বৈকি—

দিলদার। শুধু হাসে না, হাসবার জন্য অনেকে যেন বিশেষ চিন্তিত বলে বোধহয়, এমনকি—তার জন্য পয়সা খরচ করে।

মোরাদ। হাঃ হাঃ হাঃ!

দিলদার। ঈশ্বর মানুষের জিভ দিয়েছিলেন—বেশ দেখা যাচ্ছে চাখবার জন্য; কিন্তু মানুষ তার দ্বারা ভাষার সৃষ্টি করে ফেললে। ঈশ্বর নাক দিয়েছিলেন কেন? নিশ্বাস ফেলবার জন্য তো?

মোরাদ। হাঁ, আর শুঁকবার জন্যও বোধহয়।

দিলদার। কিন্তু মানুষ তার উপর বাহাদুরি করেছে! সে আবার সেই নাকের উপর চশমা পরে। দয়াময়ের নিশ্চয়ই সে উদ্দেশ্য ছিল না।—আবার অনেকের নাক ঘুমের ঘোরে বেশ একটু ডাকেও।

মোরাদ। তা ডাকে। আমার কিন্তু ডাকে না।

দিলদার। আজ্ঞে, জাঁহাপনার শুধু-যে ডাকে তা নয়, সে দিনে-দুপুরে ডাকে।

মোরাদ। আচ্ছা, এবার যখন ডাকবে তখন দেখিয়ে দিও।

দিলদার। ঐ একটা জিনিস জাঁহাপনা, যা নিরাকার ঈশ্বরের মতো ঠিক দেখানো যায় না। কারণ, দেখিয়ে দেবার অবস্থা যখন হয়, তখন সে আর ডাকে না।

মোরাদ। আচ্ছা, দিলদার, ঈশ্বর মানুষকে যে কান দিয়েছেন, তার উপর মানুষ কি বাহাদুরি করতে পেরেছে?

দিলদার। ও বাবা! তাই দিয়ে একটা দার্শনিক তথ্যই আবিষ্কার করে ফেললে যে, কান টানলে মাথা আসে—অবশ্য তার পেছনে যদি একটা মাথা থাকে; অনেকের তা নেই কি না!

মোরাদ। নেই নাকি! হাঃ হাঃ—ঐ দাদা আসছেন। তুমি এখন যাও।

দিলদার। যে আজ্ঞে।

[দিলদারের প্রস্থান। অপর দিক দিয়া ঔরংজীবের প্রবেশ।]

মোরাদ। এসো দাদা, তোমায় আলিঙ্গন করি। তোমার বুদ্ধিবলেই আমাদের এই যুদ্ধ জয় হয়েছে। [আলিঙ্গন]

ঔরংজীব। আমার বুদ্ধিবলে, না তোমার শৌর্যবলে? কী অদ্ভুত শৌর্য তোমার! মৃত্যুকে একেবারে ভয় করো না।

মোরাদ। আসফ খাঁ একটা কথা বলতেন মনে আছে যে, যারা মৃত্যুকে ভয় করে, তারা জীবন ধারণ করার যোগ্য নয়। সে যা হোক, তুমি যশোবন্ত সিংহের ৪০,০০০ মোগলসৈন্য কী মন্ত্রবলে বশ করলে! তারা শেষে যশোবন্ত সিংহেরই রাজপুতসৈন্যের বিপক্ষে বন্দুক লক্ষ্য করে ফিরে দাঁড়াল! যেন একটা ভৌতিক ব্যাপার!

ঔরংজীব। যুদ্ধের পূর্বদিন আমি জনকতক সৈন্যকে মোল্লা সাজিয়ে এপারে পাঠিয়েছিলাম। তারা মোগলদের বুঝিয়ে গেল যে, কাফেরের অধীনে, কাফেরের সঙ্গে দারার যুদ্ধ করা বড় হেয় কাজ; আর সেটা কোরানে নিষিদ্ধ। তারা তাই ঠিক বিশ্বাস করেছে।

মোরাদ। আশ্চর্য তোমার কৌশল!

ঔরংজীব। কার্যসিদ্ধির জন্য শুদ্ধ একটা উপায়ের উপর নির্ভর করা উচিত নয়। যত রকম উপায় আছে ভাবতে হবে।

মহম্মদের প্রবেশ

ঔরংজীব। কী সংবাদ মহম্মদ?

মহম্মদ। পিতা! মহারাজ যশোবন্ত সিংহ তাঁর শকটে চড়ে সসৈন্যে আমাদের সৈন্যশিবির প্রদক্ষিণ করছেন। আমরা আক্রমণ করব?

ঔরংজীব। না।

মহম্মদ। এর উদ্দেশ্য কী?

ঔরংজীব। রাজপুত দর্প! এই দর্পই মহারাজের পরাজয়। আমি সসৈন্যে নর্মদাতীরে উপস্থিত হওয়া মাত্রই যদি তিনি আমায় আক্রমণ করতেন তো আমার পরাজয় অনিবার্য ছিল। কারণ তুমি তখন এসে উপস্থিত হওনি, আর আমার সৈন্যরাও পথশ্রান্ত ছিল; কিন্তু শুনলাম এরূপ আক্রমণ করা বীরোচিত নয় বলে মহারাজ তোমার আগমনের অপেক্ষা করছিলেন। অতি দর্পে পতন হবেই।

মহম্মদ। আমরা তবে তাঁকে আক্রমণ করব না?

ঔরংজীব। না মহম্মদ! আমার সৈন্যশিবির প্রদক্ষিণ করে যদি মহারাজের কিছু সান্ত্বনা হয় তো একবার কেন, তিনি দশবার প্রদক্ষিণ করুন-না। যাও।

[মহম্মদের প্রস্থান]

ঔরংজীব। পুত্র যুদ্ধ পেলে হয়।—সরল, উদার, নির্ভীক পুত্র। আমি তবে এখন যাই, তুমি বিশ্রাম করো।

মোরাদ। আচ্ছা; দৌবারিক! সিরাজি আর বাইজি!

[প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—কাশীতে সুজার সৈন্যশিবির। কাল—রাত্রি।

সুজা ও পিয়ারা

সুজা। শুনেছ পিয়ারা, দারার পুত্র—বালক সোলেমান এই যুদ্ধে আমার বিপক্ষে এসেছে।

পিয়ারা। তোমার বড়ভাই দারার পুত্র দিল্লি থেকে এসেছেন? সত্য নাকি! তা হলে নিশ্চয়ই দিল্লির লাড্ডু এনেছেন। তুমি শীঘ্র সেখানে লোক পাঠাও। হাঁ করে চেয়ে রয়েছ কী! লোক পাঠাও।

সুজা। লাড্ডু কী! যুদ্ধ—তার সঙ্গে—

পিয়ারা। তার সঙ্গে যদি বেলের মোরব্বা থাকে তো আরও ভালো। তাতেও আমার অরুচি নাই; কিন্তু দিল্লির লাড্ডু শুনতে পাই, যো খায়া উয়োবি পাস্তায়া—আর যো নেই খায়া উয়োবি পাস্তায়া। দুরকমেই যখন পস্তাতে হচ্ছে, তখন না-খেয়ে পস্তানোর চেয়ে খেয়ে পস্তানোই ভালো—লোক পাঠাও।

সুজা। তুমি একনিশ্বাসে এতখানি বলে গেলে যে, আমি বাকিটুকু বলবার ফুরসত পেলাম না।

পিয়ারা। তুমি আবার বলবে কী! তুমি তো কেবল যুদ্ধ করবে।

সুজা। আর যা-কিছু বলতে হবে, তা বলবে বুঝি তুমি?

পিয়ারা। তা বৈকি। আমরা যেমন গুছিয়ে বলতে পারি, তোমরা তা পারো? তোমরা কিছু বলতে গেলেই এমন বিষয়গুলো জড়িয়ে ফেলো, আর এমন ব্যাকরণ ভুল করো যে—

সুজা। যে কী?

পিয়ারা। আর অভিধানের অর্ধেক শব্দই তোমরা জানো না। কথা বলেছ, কি ভুল করে বসে আছ। বোবা-শব্দ অন্ধ-ব্যাকরণ মিশিয়ে, এমন এক খোঁড়া ভাষা প্রয়োগ করো যে, তার অন্তত কুঁজো হয়ে চলতে হবেই।

সুজা। তোমার নিজের প্রয়োগগুলি খুব সাধু বলে বোধ হচ্ছে না!

পিয়ারা। ঐ তো! আমাদের ভাষা বুঝবার ক্ষমতাটুকুও তোমাদের নাই? হা ঈশ্বর! এমন একটা বুদ্ধিমান স্ত্রীজাতিকে এমন নির্বোধ পুরুষজাতির হাতে সঁপে দিয়েছ, যে, তার চেয়ে তাদের যদি গরম তেলের কড়ায় চড়িয়ে দিতে, তাহলে বোধহয় তারা সুখে থাকত।

সুজা। যাক—তুমি বলে যাও।

পিয়ারা। সিংহের বল দাঁতে, হাতির বল শুঁড়ে, মহিষের বল শিঙে, ঘোড়ার বল পিছনকার পায়ে, বাঙালির বল পিঠে আর নারীর বল জিভে।

সুজা। না, নারীর বল অপাঙ্গে।

পিয়ারা। উঁহুঁ—অপাঙ্গ প্রথম কিছু কাজ করে থাকতে পারে বটে কিন্তু পরে সমস্ত জীবনটা স্বামীকে শাসিয়ে রাখে ঐ জিভে।

সুজা। না, তুমি আমাকে কথা কইবার অবকাশ দেবে না দেখতে পাচ্ছি। শোনো কী বলতে যাচ্ছিলাম—

পিয়ারা। ঐ তো তোমাদের দোষ। এতখানি ভূমিকা করো যে, সেই অবকাশে তোমাদের বক্তব্যটা ভুলে বসে থাকো।

সুজা। তুমি আর খানিক যদি ঐরকম বকে যাও তো আমার বক্তব্যটা আমি সত্যিই ভুলে যাব।

পিয়ারা। তবে চট করে বলো। আর দেরি কোরো না।

সুজা। তবে শোনো—

পিয়ারা। বলো; কিন্তু সংক্ষেপে। মনে থাকে যেন—এক নিশ্বাসে।

সুজা। এখন আমার বিরুদ্ধে এসেছে দারার পুত্র সোলেমান। আর তার সঙ্গে বিকানীরের মহারাজ জয়সিংহ আর সৈন্যাধ্যক্ষ দিলীর খাঁ।

পিয়ারা। বেশ, একদিন নিমন্ত্রণ করে খাইয়ে দাও!

সুজা। না। তুমি ছেলেমানুষিই করবে! এমন একটা গাঢ় ব্যাপার যুদ্ধ, তা তোমার কাছে—

পিয়ারা। তার জন্যই তো তাকে একটু—হ্যাঁ— তরল করে নিচ্ছি। নইলে হজম হবে কেন! বলে যাও।

সুজা। এখনই মহারাজ জয়সিংহ আমার কাছে এসেছিলেন। তিনি বলেন যে, সম্রাট সাজাহান মরেননি। এমনকি তিনি সম্রাটের দস্তখতি পত্র আমায় দিলেন। সে পত্রে কী আছে জানো?

পিয়ারা। শীঘ্র বলে ফেলো আর আমার ধৈর্য থাকছে না।

সুজা। সে-পত্রে তিনি লিখেছেন যে আমি যদি এখনও বঙ্গদেশে ফিরে যাই, তাহলে তিনি আমায় এই সুবা থেকে চ্যুত করবেন না। নইলে—

পিয়ারা। নইলে চ্যুত করবেন! এই তো। যাক! তার পরে আর কিছু তো বলবার নেই? আমি এখন গান গাই?

সুজা। আমি কী লিখে দিলাম জানো? আমি লিখে দিলাম—বেশ, আমি বিনাযুদ্ধে বঙ্গদেশে ফিরে যাচ্ছি। পিতার প্রভুত্ব আমি মাথা পেতে নিতে সম্মত আছি; কিন্তু দারার প্রভুত্ব আমি কোনোমতেই মানব না।

পিয়ারা। তুমি আমায় গাইতে দেবে না। নিজেই বকে যাচ্ছ, আমি গাইব না!

সুজা। না, গাও! আমি চুপ করলাম!

পিয়ারা। দেখ, প্রতিজ্ঞা মনে রেখো। কী গাইব?

সুজা। যা ইচ্ছে। —না। একটা প্রেমের গান গাও—এমন একটা গান গাও, যার ভাষায় প্রেম, ভাবে প্রেম, ভঙ্গিমায় প্রেম, মূর্ছনায় প্রেম, সমে প্রেম।—গাও আমি শুনি।

পিয়ারা গীত আরম্ভ করিলেন

সুজা। দূরে একটা শব্দ শুনছ না পিয়ারা— যেন বারিবর্ষণের শব্দ।—ঐ যে।

পিয়ারা। না, তুমি গাইতে দেবে না। আমি চললাম।
সুজা। না, ও কিছু নয়, গাও।

পিয়ারার গীত

এ জীবনে পুরিল না সাধ ভালোবাসি।
ক্ষুদ্র এ হৃদয় হায় ধরে না ধরে না তায়—
আকুল অসীম প্রেমরাশি।
তোমার হৃদয়খানি আমার হৃদয়ে আনি
রাখি না কেনই যত কাছে,
যুগল হৃদয় মাঝে কী যেন বিরহ বাজে,
কী যেন অভাবই রহিয়াছে।
এ ক্ষুদ্র জীবন মোর এ ক্ষুদ্র ভুবন মোর,
হেথা কী দিব এ ভালোবাসা।
যত ভালোবাসি তাই আরও বাসিতে চাই—
দিয়ে প্রেম মিটে নাকো আশা।
হউক অসীম স্থান হউক অমর প্রাণ
ঘুচে যাক সব অবরোধ;
তখন মিটাব আশা দিব ঢালি ভালোবাসা
জন্মঋণ করি পরিশোধ।

সুজা। এ জীবন একটা সুষুপ্তি। মাঝে মাঝে স্বপ্নের মতো স্বর্গ থেকে একটা ভঙ্গিমা, একটা সঙ্কেত নেমে আসে, যাতে বুঝিয়ে দেয়, এ সুপ্তির জাগরণ কী মধুর—সঙ্গীত সেই স্বর্গের একটা ঝঙ্কার। নইলে এত মধুর হয়!

নেপথ্যে কামানের শব্দ

সুজা [চমকিয়া] ও কী!
পিয়ারা। তাই তো! প্রিয়তম! এত রাত্রে কামানের শব্দ—এত কাছে! শত্রু তো ওপারে!
সুজা। এ কী! ঐ আবার! আমি দেখে আসি।
[প্রস্থান]
পিয়ারা। তাই তো! বারবার ঐ কামানের ধ্বনি। ঐ সৈন্যদলের নিনাদ, অস্ত্রের ঝনৎকার—রাত্রির এই গভীর শান্তি হঠাৎ যেন শেলবিদ্ধ হয়ে একটা মহা কোলাহলে আর্তনাদ করে উঠল।—এ সব কী!

বেগে সুজার প্রবেশ

সুজা। পিয়ারা! সম্রাটসৈন্য শিবির আক্রমণ করেছে।
পিয়ারা। আক্রমণ করেছে! সে কী!
সুজা। হাঁ! বিশ্বাসঘাতক এই মহারাজ!— আমি যুদ্ধে যাচ্ছি। তুমি শিবিরে যাও। কোনো ভয় নাই পিয়ারা— [প্রস্থান]

পিয়ারা। কোলাহল ক্রমে বাড়তে চলল। উহ্ এ কী—

[প্রস্থান]

নেপথ্যে কোলাহল

সোলেমান ও দিলীর খাঁ'র বিপরীত দিক হইতে প্রবেশ।

সোলেমান। সুবাদার কই!

দিলীর। তিনি নদীর দিকে পালিয়েছেন।

সোলেমান। পালিয়েছেন? তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করো দিলীর খাঁ।

দিলীর খাঁর প্রস্থান ও জয়সিংহের প্রবেশ

সোলেমান। মহারাজ! আমরা জয়লাভ করেছি।

জয়সিংহ। আপনি রাত্রেই নদী পার হয়ে শত্রুশিবির আক্রমণ করেছেন?

সোলেমান। করব যে, তারা কিন্তু তা ভাবেনি—তবু এত শীঘ্র জয়লাভ করব কখনো মনে করিনি।

জয়সিংহ। সুলতান সুজার সৈন্য একেবারে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। যখন অর্ধেক সৈন্য নিহত হয়েছে, তখনও তাদের সম্পূর্ণ ঘুম ভাঙেনি।

সোলেমান। তার কারণ, কাকা প্রকৃত যোদ্ধা। তিনি নৈশ আক্রমণের সম্ভাবনা জানতেন না?

জয়সিংহ। আমি সম্রাটের পক্ষ হতে তাঁর সঙ্গে সন্ধি করেছিলাম। তিনি বিনাযুদ্ধে বঙ্গদেশে ফিরে যেতে সম্মত হয়েছিলেন, এমনকি যাবার জন্য নৌকা প্রস্তুত করতে আজ্ঞা দিয়েছিলেন।

দিলীর খাঁ'র প্রবেশ

দিলীর। শাহাজাদা! সুলতান সুজা সপরিবারে নৌকাযোগে পালিয়েছেন।

জয়সিংহ। ঐ—তবে সেই সজ্জিত নৌকায়।

সোলেমান। পশ্চাদ্ধাবন করো—যাও সৈন্যদের আজ্ঞা দাও [দিলীর খাঁ'র প্রস্থান]

সোলেমান। আপনি কার আজ্ঞায় এ সন্ধি করেছিলেন মহারাজ?

জয়সিংহ। সম্রাটের আজ্ঞায়।

সোলেমান। পিতা তো আমাকে এ-কথা কিছু লেখেননি? তা আপনিও আমায় বলেননি!

জয়সিংহ। সম্রাটের নিষেধ ছিল।

সোলেমান। তার উপরে মিথ্যা কথা।—যান।

[জয়সিংহের প্রস্থান]

সোলেমান। সম্রাটের এক আজ্ঞা আর আমার পিতার অন্যরূপ আজ্ঞা! এ কি সম্ভব?—যদি তাই হয়! মহারাজকে হয়তো অন্যায় ভর্ৎসনা করেছি। যদি সম্রাটের এরূপই আজ্ঞা হয়!—এদিকে পিতা লিখেছেন যে "সুজাকে সপরিবারে বন্দি করে নিয়ে আসবে পুত্র।" না, আমি পিতার আজ্ঞা পালন করব। তাঁর আজ্ঞা আমার কাছে ঈশ্বরের আজ্ঞা।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—যোধপুরের দুর্গ। কাল—প্রভাত
মহামায়া ও চারণীগণ

মহামায়া। গাও আবার চারণীগণ।

চারণীগণের গীত

যেথা গিয়াছেন তিনি সমরে,
আনিতে জয়গৌরব জিনি
সেথা গিয়াছেন তিনি মহা আহ্বানে—
মানের চরণে প্রাণ বলিদানে;
মথিতে অমর মরণসিন্ধু আজি গিয়াছেন তিনি।
সধবা অথবা বিধবা তোমার রহিবে উচ্চ শির;
উঠো বীরজায়া, বাঁধো কুন্তল, মুছো এ অশ্রুনীর।
সেথা গিয়াছেন তিনি
করিতে রক্ষা শত্রুর নিমন্ত্রণে।
সেথা বর্মে বর্মে কোলাকুলি হয়;
খড়্গে খড়্গে ভীম পরিচয়,
ভ্রূকুটির সহ গর্জন মিশে রক্ত রক্ত সনে।
সধবা অথবা—ইত্যাদি।
সেথা নাহি অনুনয় নাহি পলায়ন—
সে ভীম সমর মাঝে;
সেথা রুধিরসিক্ত অসিত অঙ্গে
মৃত্যু নৃত্য করিছে রঙ্গে
গভীর আর্তনাদের সঙ্গে বিজয়বাদ্য বাজে।
সধবা অথবা—ইত্যাদি।
সেথা গিয়াছেন তিনি সে মহা আহবে
জুড়াইতে সব জ্বালা;
হেথা হয়তো ফিরিতে জিনিয়া সমর;
হয়তো মরিয়া হইতে অমর;
সে মহিমা ক্রোড়ে ধরিয়া হাসিয়া
তুমিও মরিবে বালা।
সধবা অথবা—ইত্যাদি।

দুর্গপ্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। মহারানী।

মহামায়া। কী সংবাদ সৈনিক!

প্রহরী। মহারাজ ফিরে এসেছেন।

মহামায়া। এসেছেন? যুদ্ধে জয়লাভ করে এসেছেন?

প্রহরী। না মহারানী! তিনি এ-যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছেন।

মহামায়া। পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছেন?— কী বলছ তুমি সৈনিক! কে পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছেন?

প্রহরী। মহারাজ।

মহামায়া। কী! মহারাজ যশোবন্ত সিংহ পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছেন? এ কি শুনছি ঠিক! যোধপুরের মহারাজ—আমার স্বামী—যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছেন! ক্ষত্রিয় শৌর্যের কি এতদূর অধোগতি হয়েছে! অসম্ভব! ক্ষত্রবীর যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ফেরে না। মহারাজ যশোবন্ত সিংহ ক্ষত্রচূড়ামণি। যুদ্ধে পরাজয় হয়েছে; হতে পারে। তা হয়ে থাকে তো আমার স্বামী যুদ্ধক্ষেত্রে মরে পড়ে আছেন। মহারাজ যশোবন্ত সিংহ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে কখনো ফিরে আসেননি। যে এসেছে সে মহারাজ যশোবন্ত সিংহ নয়। সে তাঁর আকারধারী কোনো ছদ্মবেশী। তাকে প্রবেশ করতে দিও না! দুর্গদ্বার রুদ্ধ করো।—গাও চারণীগণ আবার গাও।

চারণীগণের গীত

যেথা গিয়াছেন তিনি সে মহা আহবে
জুড়াইতে সব জ্বালা, ইত্যাদি।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—পরিত্যক্ত প্রান্তর। কাল—রাত্রি।

ঔরংজীব একাকী

ঔরংজীব। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। ঝড় উঠবে। একটা নদী পার হয়েছি, এ আর এক নদী—ভীষণ কল্লোলিত তরঙ্গসঙ্কুল। এত প্রশস্ত যে তার ওপার দেখতে পাচ্ছি না। তবু পার হতে হবে—এই নৌকা নিয়েই।

মোরাদের প্রবেশ

ঔরংজীব। কী মোরাদ! কী সংবাদ!

মোরাদ। দারার সঙ্গে একলক্ষ ঘোড়সোয়ার আর একশত কামান।

ঔরংজীব। তবে সংবাদ ঠিক!

মোরাদ। ঠিক; প্রত্যেক চরের ঐ একইরূপ অনুমান।

ঔরংজীব। [পদচারণা করিতে করিতে] এ যে—না—তাই তো!

মোরাদ। দারা ঐ পাহাড়ের পরপারে সেনানিবেশ করেছেন।

ঔরংজীব। ঐ পাহাড়?

মোরাদ। হাঁ দাদা!

ঔরংজীব। তাই তো! একলক্ষ অশ্বারোহী—আর—

মোরাদ। আমরা কাল প্রভাতেই—

ঔরংজীব। চুপ! কথা কোয়ো না! আমাকে ভাবতে দাও! এত সৈন্য দারা পেলেন কোথা থেকে! আর একশত কামান!—আচ্ছা তুমি এখন যাও মোরাদ। আমায় ভাবতে দাও।

[মোরাদের প্রস্থান]

ঔরংজীব। তাই তো! এখন পিছোলে সর্বনাশ, আক্রমণ করলে ধ্বংস—একশত কামান। যদি—না—তাই বা হবে কেমন করে। হুঁ [দীর্ঘনিশ্বাস]—ঔরংজীব! এবার তোমার উত্থান না পতন! পতন? অসম্ভব। উত্থান? কিন্তু কী উপায়ে? কিছু বুঝতে পারছি না।

মোরাদের প্রবেশ

ঔরংজীব। তুমি আবার কেন?

মোরাদ। দাদা, বিপক্ষ পক্ষ থেকে শায়েস্তা খাঁ তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

ঔরংজীব। এসেছেন? উত্তম, সসম্মানে নিয়ে এসো। না—আমি স্বয়ং যাচ্ছি।

[প্রস্থান]

মোরাদ। তাই তো! শায়েস্তা খাঁ আমাদের শিবিরে কী জন্য! দাদা ভিতরে ভিতরে কী মতলব আঁটছেন বুঝছি না। শায়েস্তা খাঁ কি দারার প্রতি বিশ্বাসহন্তা হবে, দেখা যাক। [পরিক্রমণ]

ঔরংজীবের প্রবেশ

ঔরংজীব। ভাই মোরাদ! এই মুহূর্তে আগ্রায় যাবার জন্যে সসৈন্যে রওনা হতে হবে। প্রস্তুত হও।

মোরাদ। সে কী! এই রাত্রে!

ঔরংজীব। হাঁ, এই রাত্রে। শিবির যেমন আছে তেমনি থাকুক। দারার সৈন্য আমরা আক্রমণ করব না। ঐ পাহাড়ের অপর পার দিয়ে আগ্রায় যাবার একটি রাস্তা আছে। সেখান দিয়ে চলে যাবে। দারা সন্দেহ করবেন না। তাঁর আগে আমাদের আগ্রায় যেতে হবে। প্রস্তুত হও।

মোরাদ। এই রাত্রে!

ঔরংজীব। তর্কের সময় নাই। সিংহাসন চাও তো দ্বিরুক্তি কোরো না। নইলে সর্বনাশ—নিশ্চিত জেনো। [উভয়ে নিষ্ক্রান্ত]

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—এলাহাবাদে সোলেমানের শিবির।
কাল—প্রাতঃ।

জয়সিংহ ও দিলীর খাঁ

দিলীর। ঔরংজীব শেষ যুদ্ধেও জয়ী হয়েছেন। শুনেছেন মহারাজ?
জয়সিংহ। আমি আগেই জানতাম।
দিলীর। শায়েস্তা খাঁ বিশ্বাসঘাতকতা করে; আগ্রার কাছে তুমুল যুদ্ধ হয়। দারা তাতে পরাস্ত হয়ে দোয়াবের দিকে পালিয়েছেন। সঙ্গে মোটে একশ সঙ্গী আর ত্রিশলক্ষ মুদ্রা।
জয়সিংহ। পালাতেই হবে—আমি আগেই জানতাম।
দিলীর। আপনি তো সবই জানতেন—দারা পালাবার সময় তাড়াতাড়িতে বেশি অর্থ নিয়ে যেতে পারেননি; কিন্তু তার পরেই শুনছি—বৃদ্ধ সম্রাট সাতান্নটা অশ্ব বোঝাই করে স্বর্ণমুদ্রা দারার উদ্দেশে পাঠান। পথে জাঠরা তা-ও ডাকাতি করে নিয়েছে।
জয়সিংহ। আহা বেচারি! কিন্তু আমি আগেই জানতাম।
দিলীর। ঔরংজীব ও মোরাদ বিজয়গর্বে আগ্রায় প্রবেশ করেছেন। এখন ফলত ঔরংজীব সম্রাট।
জয়সিংহ। এসব আগেই জানতাম।
দিলীর। ঔরংজীব আমাকে পত্রে লিখেছেন যে, আমি যদি সসৈন্যে সোলেমানকে পরিত্যাগ করে যাই, তাহলে তিনি আমায় পুরস্কার দেবেন। আপনাকেও বোধহয় তাই লিখেছেন মহারাজ?
জয়সিংহ। হাঁ।
দিলীর। যুদ্ধের ভবিষ্যৎ ফল সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা মহারাজ?
জয়সিংহ। আমি কাল এক জ্যোতিষীকে দিয়ে এই যুদ্ধের ফলাফল নির্ণয় করিয়েছিলাম। তিনি বলেন, ভাগ্যের আকাশে এখন ঔরংজীবের তারা উঠছে, আর দারার তারা নেমে যাচ্ছে!
দিলীর। তবে আমাদের এখন কর্তব্য কী মহারাজ?
জয়সিংহ। আমি যা করি তাই দেখে যাও।
দিলীর। বেশ—এসব বিষয়ে আমার বুদ্ধিটা ঠিক খেলে না; কিন্তু একটা কথা—
জয়সিংহ। চুপ! সোলেমান আসছেন।

সোলেমানের প্রবেশ

জয়সিংহ ও দিলীর। বন্দেগি শাহাজাদা!

সোলেমান। মহারাজ! পিতা পরাজিত পলায়িত!—এই সম্রাট সাজাহানের পত্র। [পত্র দিলেন]
জয়সিংহ। [পত্রপাঠপূর্বক] তাই তো কুমার!
সোলেমান। সম্রাট আমাকে পিতার সাহায্যে সসৈন্যে অবিলম্বে যাত্রা করতে লিখেছেন। আমি এক্ষণেই যাব। তাঁবু ভাঙুন আর সৈন্যদের আদেশ দিউন যে—
জয়সিংহ। আমার বিবেচনায় কুমার আরও ঠিক খবরের জন্যে অপেক্ষা করা উচিত। কি বলো খাঁ সাহেব?
দিলীর। আমারও সেই মত।
সোলেমান। এর চেয়ে ঠিক খবর কী হতে পারে? স্বয়ং সম্রাটের হস্তাক্ষর।
জয়সিংহ। আমার বোধহয় ও জাল। বিশেষ সম্রাট অথর্ব! তাঁর আজ্ঞা আজ্ঞাই নয়। আপনার পিতার আজ্ঞা ব্যতীত এখান থেকে এক পা-ও নড়তে পারি না! কি বলো দিলীর খাঁ?
দিলীর। সে ঠিক কথা।
সোলেমান। কিন্তু পিতা তো পলায়িত। আজ্ঞা দেবেন কেমন করে?
জয়সিংহ। তবে আমাদের এখন তাঁর পদস্থ ঔরংজীবের আজ্ঞার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। অবশ্য যদি এই সংবাদ সত্য হয়।
সোলেমান। কী! ঔরংজীবের আজ্ঞার জন্য—আমার পিতার শত্রুর আজ্ঞার জন্য—আমি অপেক্ষা করব?
জয়সিংহ। আপনি না করেন, আমাদের তাই করতে হবে বৈকি—কি বলো দিলীর খাঁ?
দিলীর। তা—কথাটা ঐ রকমেই দাঁড়ায় বটে!
সোলেমান। জয়সিংহ! দিলীর খাঁ—আপনারা দুজনে তাহলে ষড়যন্ত্র করেছেন?
জয়সিংহ। আমাদের দোষ কী—বিনা সমুচিত আজ্ঞায় কী করে কোনো কাজ করি! লাহোরে যুবরাজ দারার উদ্দেশে যাওয়ার সমুচিত আজ্ঞা এখনও পাইনি।
সোলেমান। আমি আজ্ঞা দিচ্ছি।
জয়সিংহ। আপনার আজ্ঞায় আমরা আপনার পিতার আজ্ঞা অবহেলা করতে পারি না। পারি খাঁ সাহেব?
দিলীর। তা কি পারি!
সোলেমান। বুঝেছি। আপনারা একটা চক্রান্ত করেছেন। আচ্ছা, আমি স্বয়ং সৈন্যদের আজ্ঞা দিচ্ছি। [সোলেমানের প্রস্থান]
দিলীর। কী বলেন মহারাজ?
জয়সিংহ। কোনো ভয়ের কারণ নাই খাঁ সাহেব। আমি সৈন্যদের সব বশ করে রেখেছি!
দিলীর। আপনার মতো বিচক্ষণ কর্মঠ ব্যক্তি আমি কখনও দেখি নাই; কিন্তু এ-কাজটা কি উচিত হচ্ছে?
জয়সিংহ। চুপ! এখন আমাদের কাজ হচ্ছে একটুখানি দাঁড়িয়ে দেখা। এখনও ঔরংজীবের পক্ষে একেবারে হেলছি না। একটু অপেক্ষা করতে হবে। কী জানি— সোলেমানের পুনঃপ্রবেশ

সোলেমান। সৈন্যেরাও এ চক্রান্তে যোগ দিয়েছে। আপনাদের বিনা আজ্ঞায় একপা-ও নড়তে চায় না।

জয়সিংহ। তাই দস্তুর বটে।

সোলেমান। মহারাজ! সম্রাট আমার পিতার সাহায্যে আমায় যেতে লিখেছেন। পিতার কাছে যাবার জন্য আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়েছে। আমি আপনাদের মিনতি করছি দিলীর খাঁ। দারার পুত্র আমি করজোড়ে আপনাদের কাছে এই ভিক্ষা চাচ্ছি যে—আপনারা না যান—আমার সৈন্যদের আজ্ঞা দেন—আমার সঙ্গে পিতার কাছে লাহোরে যেতে। আমি দেখি এই রাজ্যাপহারী ঔরংজীবের কতখানি শৌর্য। আমার এই দিগ্বিজয়ী সৈন্য নিয়ে যদি এখনো কর্মক্ষেত্রে গিয়ে পড়তে পারি—মহারাজ! —দিলীর খাঁ! আজ্ঞা দেন। এই কৃপার জন্য আপনাদের কাছে আমি আমরণ বিক্রিত হয়ে থাকব।

জয়সিংহ। সম্রাটের আজ্ঞা ভিন্ন আমরা এখান থেকে এক পা-ও নড়তে পারি না।

সোলেমান। দিলীর খাঁ—আমি জানু পেতে—যুবরাজ দারার পুত্র আমি জানু পেতে—ভিক্ষা চাচ্ছি—[জানু পাতিলেন]

দিলীর। উঠুন শাহাজাদা। মহারাজ আজ্ঞা না দেন আমি দিচ্ছি। আমি দারার নিমক খেয়েছি। মুসলমান জাত, নেমকহারামের জাত নয়। আসুন শাহাজাদা, আমি আমার অধীন সমস্ত সৈন্য নিয়ে—আপনার সঙ্গে লাহোরে যাচ্ছি। আর শপথ করছি যে, যদি শাহাজাদা আমায় ত্যাগ না করেন আমি শাহাজাদাকে ত্যাগ করব না। আমি যুবরাজ দারার পুত্রের জন্যে প্রয়োজন হয় তো প্রাণ দেব। আসুন শাহাজাদা। আমি এই মুহূর্তেই আজ্ঞা দিচ্ছি।

[সোলেমান ও দিলীরের প্রস্থান]

জয়সিংহ। তাই তো! একফোঁটা চোখের জলে গলে গেলে খাঁ সাহেব! তোমার মঙ্গল তুমি বুঝলে না। আমি কী করব; আমার অধীন সৈন্য নিয়ে তবে আমি আগ্রা যাত্রা করি।

সপ্তম দৃশ্য

সাজাহান ও জাহানারা

সাজাহান। জাহানারা! আমি সাগ্রহে ঔরংজীবের অপেক্ষা করছি। সে আমার পুত্র, আমার উদ্ধত পুত্র; আমার লজ্জা—আমার গৌরব!

জাহানারা। গৌরব পিতা? এত শঠ, এত মিথ্যাবাদী সে! সেদিন যখন আমি তাঁর শিবিরে গেলাম, সে আপনার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি দেখালে; বললে যে, সে মহাপাপ করেছে; আর সঙ্গে সঙ্গে দু-এক ফোঁটা চোখের জলও ফেললে; বললে যে দারার পক্ষে ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের নাম জানতে পারলে সে নিঃশঙ্কচিত্তে পিতার আজ্ঞামতো মোরাদকে ছেড়ে দারার পক্ষ নেবে। আমি সরলভাবে তার সে-কথায় বিশ্বাস করে তাকে অভাগা দারার হিতৈষীদের নাম দিয়েছিলাম। পথে সে-পত্র সে হস্তগত করেছে। এত কপট! এত ধূর্ত!

সাজাহান। না জাহানারা, তা সে করতে পারে না। না না না! আমি এ-কথা বিশ্বাস করব না।

জাহানারা। আসুক সে একবার এই দুর্গে। আমি কৌশলে তাকে আপনার চক্ষের সম্মুখে বন্দি করব।

সাজাহান। সে কী জাহানারা, সে আমার পুত্র, তোমার ভাই। জাহানারা, কাজ নাই। আসুক সে। আমি তাকে স্নেহে বশ করব। তাতেও যদি সে বশ না হয়—তা হলে তার কাছে, পিতা আমি—তার সম্মুখে নতজানু হয়ে আমাদের প্রাণভিক্ষা মেগে নেব! বলব আমরা আর কিছুই চাই না, আমাদের বাঁচতে দাও, আমাদের পরস্পরকে ভালোবাসার অবকাশ দাও।

জাহানারা। সে অপমান থেকে আমি আপনাকে রক্ষা করব বাবা!

সাজাহান। পুত্রের কাছে ভিক্ষায় অপমান নাই।

মহম্মদের প্রবেশ

সাজাহান। এই যে মহম্মদ! তোমার পিতা কই!

মহম্মদ। তা তো জানি না ঠাকুর্দা!

সাজাহান। সে কী! সে এখানে আসবার জন্য অশ্বারূঢ় হয়েছে—শুনলাম—

মহম্মদ। কে বললে! তিনি তো ঘোড়ায় চড়ে আকবরের কবরে নেওয়াজ পড়তে গেলেন। আমি তো যতদূর জানি, তাঁর এখানে আসবার কোনো অভিপ্রায় নাই।

জাহানারা। তবে তুমি এখানে কেন মহম্মদ!

মহম্মদ। এ প্রাসাদ-দুর্গ অধিকার করতে।

সাজাহান। সে কী! না তুমি পরিহাস করছ মহম্মদ।

মহম্মদ। না ঠাকুর্দা, এ সত্য কথা!

জাহানারা। বটে! তবে আমি তোমাকেই বন্দি করব।

বাঁশি বাজাইলেন। সশস্ত্র পঞ্চ প্রহরীর প্রবেশ

জাহানারা। অস্ত্র দাও মহম্মদ।

মহম্মদ। সে কী!

জাহানারা। তুমি আমার বন্দি। সৈনিকগণ! অস্ত্র কেড়ে নাও!

মহম্মদ। তবে আমারও রক্ষীদের ডাকতে হল।

বাঁশি বাজাইলেন। দশজন দেহরক্ষীর প্রবেশ

মহম্মদ। আমার সহস্র সৈনিকগণকে ডাকো।

জাহানারা। সহস্র সৈনিক! কে তাদের দুর্গমধ্যে প্রবেশ করতে দিলে!

সাজাহান। আমি দিয়েছি জাহানারা। সব দোষ আমার। আমি স্নেহবশে ঔরংজীব পত্রে যা চেয়েছিল, সব দিয়েছিলাম। ওহ্, আমি এ স্বপ্নেও ভাবিনি—মহম্মদ!

মহম্মদ। ঠাকুর্দা!

সাজাহান। আমি কি তবে এখন বুঝব, যে আমি তোমার হস্তে বন্দি?

মহম্মদ। বন্দি নন ঠাকুর্দা। তবে আপনার বাইরে যাবার অনুমতি নাই।

সাজাহান। আমি ঠিক বুঝতে পারছিনে। একি একটা সত্য ঘটনা? না সব স্বপ্ন? আমি কে? আমি সম্রাট সাজাহান? তুমি আমার পৌত্র, আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে তরবারি খুলে? এ কী! একদিনে কি সংসারের নিয়ম সব উল্টে গেল। একদিন যার রোষকষায়িত চক্ষু দেখে ঔরংজীব ভয়ে অর্ধেক মাটির মধ্যে সেঁধিয়ে যেত—তার—তার পুত্রের হাতে— বন্দি! জাহানারা! কই! এই যে! এ কী কন্যা! তোর ঠোঁট নড়ছে, কথা বার হচ্ছে না; চক্ষু দিয়ে একটা নিষ্প্রভ স্থির শূন্যদৃষ্টি নির্গত হচ্ছে; গণ্ডদুটি ছাইয়ের মতো শাদা হয়ে গিয়েছে।—কী হয়েছে মা?

জাহানারা। না বাবা! কিন্তু জানতে পারলে কেমন করে! আমি শুধু তাই ভাবছি!

সাজাহান। মহম্মদ! ভেবেছ আমি এই শাঠ্য, এই অত্যাচার—এখানে এইরকম বসে নিঃসহায়ভাবে সহ্য করব! ভেবেছ এই কেশরী স্থবির বলে তোমরা তাকে পদাঘাত করে যাবে? আমি বৃদ্ধ সাজাহান বটে; কিন্তু আমি সাজাহান। এই, কে আছ! নিয়ে এসো আমার বর্ম আর তরবারি।—কই, কেউ নেই!

মহম্মদ। ঠাকুর্দা, আপনার দেহরক্ষীদের দুর্গের বার করে দেওয়া হয়েছে।

সাজাহান। কে দিয়েছে?

মহম্মদ। আমি।

সাজাহান। কার আজ্ঞায়?

মহম্মদ। পিতার আজ্ঞায়। এক্ষণে আমার এই সহস্র সৈনিকই জাঁহাপনার দেহরক্ষীদের কাজ করবে।

সাজাহান। মহম্মদ! বিশ্বাসঘাতক!

মহম্মদ। আমি আমার পিতার আজ্ঞাবহ মাত্র।

সাজাহান। ঔরংজীব! না, আজ সে কোথায়, আর আমি কোথায়! তবু যদি জাহানারা, আজ দুর্গের বাইরে গিয়ে একবার আমার সৈন্যদের সম্মুখে দাঁড়াতে পারতাম, তাহলে এখনও এই বৃদ্ধ সাজাহানের জয়ধ্বনিতে ঔরংজীব মাটিতে নুয়ে পড়ত! একবার খোলা পাই না! একবার খোলা পাই না!—মহম্মদ! আমায় একবার মুক্ত করে দাও। একবার! একবার!

মহম্মদ। ঠাকুর্দা, আমায় দোষ দেবেন না। আমি পিতার আজ্ঞাবহ।

সাজাহান। আর আমি তোমার পিতার পিতা না? সে যদি তার পিতার প্রতি হেন অত্যাচারী হয়—তুমি কেন তোমার পিতার আজ্ঞাবহ হবে!—মহম্মদ! এসো! দুর্গদ্বার খুলে দাও।

মহম্মদ। মার্জনা করবেন ঠাকুর্দা! আমি পিতার আজ্ঞার অবাধ্য হতে পারি না।

সাজাহান। দেবে না? দেবে না? দেখ, আমি তোমার বৃদ্ধ পিতামহ—রুগ্ণ, জীর্ণ, স্থবির। আর কিছু চাই না। শুধু একবার মাত্র এই দুর্গের বাইরে যেতে চাই। আবার ফিরে আসব শপথ করছি। দেবে না—দেবে না?

মহম্মদ। ক্ষমা করবেন ঠাকুর্দা—আমি তা পারব না।

গমনোদ্যত

সাজাহান। দাঁড়াও মহম্মদ! [কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া, গিয়া রাজমুকুট আনিয়া ও শয্যা হইতে কোরান লইয়া] দেখ মহম্মদ! এই আমার মুকুট, এই আমার কোরান! এই কোরান স্পর্শ করে আমি শপথ করছি যে বাইরে গিয়ে সমবেত প্রজাদের সম্মুখে এই মুকুট আমি তোমার মাথায় পরিয়ে দেব! কারো সাধ্য নাই যে প্রতিবাদ করে। আমি আজ শীর্ণ, পক্ষাঘাতে পঙ্গু বটে; কিন্তু সম্রাট সাজাহান এ ভারতবর্ষে এতদিন ধরে এমন শাসন করে এসেছে যে, যদি সে একবার তার সৈন্যদের সম্মুখে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারে, তাহলে শুধু তাদের মিলিত অগ্নিময় দৃষ্টিতে শত ঔরংজীব ভস্ম হয়ে পুড়ে যাবে।—মহম্মদ! আমায় মুক্ত করে দাও। তুমি ভারতের অধীশ্বর হবে! আমি শপথ করছি মহম্মদ! শপথ করছি! আমি শুধু এই কপট ঔরংজীবকে একবার দেখাব। মহম্মদ!

মহম্মদ। ঠাকুর্দা মার্জনা করবেন।

সাজাহান। দেখ! এ ছেলেখেলা নয়। আমি স্বয়ং সম্রাট সাজাহান—কোরান স্পর্শ করে শপথ করছি। এ বাতুলের প্রলাপ নয়। শপথ করছি—দেখ, একদিকে তোমার পিতার আজ্ঞা, আর-একদিকে ভারতের সাম্রাজ্য—বেছে নাও এই মুহূর্তে!

মহম্মদ। ঠাকুর্দা, আমি পিতার আজ্ঞার অবাধ্য হতে পারি না।

সাজাহান। একটা সাম্রাজ্যের জন্যও না?

মহম্মদ। পৃথিবীর জন্যও না।

সাজাহান। দেখ মহম্মদ! বিবেচনা করে দেখ। ভালো করে বিবেচনা করো—ভারতের অধীশ্বর—

মহম্মদ। আর আমি এখানে দাঁড়িয়ে এ-কথা শুনব না। প্রলোভন বড়ই অধিক। হৃদয় বড়ই দুর্বল। ঠাকুর্দা, মার্জনা করবেন।

[প্রস্থান]

সাজাহান। চলে গেল! চলে গেল! জাহানারা! কথা কচ্চিস না যে!

জাহানারা। ঔরংজীব! তোমার এই পুত্র! যে তার পিতার আজ্ঞা পালন করতে একটা সাম্রাজ্য দিতে পারে—আর তুমি তোমার পিতার এত স্নেহের বিনিময়ে তাকে ছলে বন্দি করেছ!

সাজাহান। সত্য বলেছ কন্যা!—পিতা সব, আর নিজে না-খেয়ে পুত্রদের খাইও না; বুকের উপর রেখে ঘুম পাড়িও না; তাদের হাসিটি দেখার জন্য স্নেহের হাসিটি হেসো না। তারা সব কৃতঘ্নতার অঙ্কুর। তারা সব শিশু-শয়তান। তাদের আধপেটা খাইয়ে মানুষ কোরো। তাদের সকালে বিকালে জোরে কষাঘাত কোরো। তাদের সারা-জীবনটা চোখ রাঙিয়ে শাসিয়ে রেখো। তাহলে বোধহয় তারা এই মহম্মদের মতো বাধ্য, পিতৃভক্ত হবে। তাদের এই শাস্তি দিতে যদি তোমাদের বুকে ব্যথা লাগে তো বুক ভেঙে ফেলো, চোখে জল আসে তো চোখ উপড়ে তুলে ফেলো; আর্তনাদ করতে ইচ্ছা হয় তো নিজের টুঁটি ধোরো। ওহ্—

জাহানারা। বাবা, এই কারাগারের কোণে বসে অসহায় শিশুর মতো ক্রন্দন করলে কিছু হবে না; পদাহত পঙ্গুর মতো বসে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করে অভিশাপ দিলে কিছু হবে না। পাপী মুমূর্ষুর মতো অন্তিমে একবার ঈশ্বরকে 'দয়াময়' বলে ডাকলে কিছু হবে না! উঠুন, দলিত ভুজঙ্গের মতো ফণা বিস্তার করে উঠুন; হৃতশাবক ব্যাঘ্রের মতো প্রমত্ত বিক্রমে গর্জে উঠুন; অত্যাচারে ক্ষিপ্ত জাতির মতো জেগে উঠুন। নিবৃত্তির মতো কঠিন হউন; হিংসার মতো অন্ধ হউন; শয়তানের মতো ক্রূর হউন। তবে তার সঙ্গে পারবেন।

সাজাহান। উত্তম! তবে তাই হোক! আয় মা, তুইও আমার সহায় হ। আমি অগ্নির মতো জ্বলে উঠি, তুই বায়ুর মতো ধেয়ে আয়! আমি ভূমিকম্পের মতো সাম্রাজ্যখানি ভেঙেচুরে দিয়ে যাই, তুই সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের মতো তাকে এসে গ্রাস কর্। আমি যুদ্ধ নিয়ে আসি; তুই মড়ক নিয়ে আয়! আয় তো; একবার সাম্রাজ্য তোলপাড় করে দিয়ে চলে যাই—তার পর কোথায় যাই?—কিছুই যায় আসে না। ধূপের মতো একটা বিরাট জ্বালায় ঊর্ধ্বে উঠে—বিরাট হাহাকারে শূন্যে ছড়িয়ে পড়ি।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—মথুরায় ঔরংজীবের শিবির। কাল—রাত্রি

দিলদার একাকী

দিলদার। মোরাদ! কেমন ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে তুমি নেমে যাচ্ছ! সুরার স্রোতে ভাসছ। নর্তকীর হাব-ভাব তার উপরে তুফান তুলে দিয়েছে। তুমি ডুববে! আর দেরি নাই। মোরাদ, তোমাকে দেখে আমার মাঝে মাঝে দুঃখ হয়। এত সরল! শাহাজাদীর প্ররোচনায় ঔরংজীবকে ছলে বন্দি করতে গিয়েছিলে। জলে নেমে কুমিরের সঙ্গে বাদ!—আজ তার প্রতি-নিমন্ত্রণ! এই-যে জাঁহাপনা!

মোরাদের প্রবেশ

মোরাদ। দাদা এখনও নেওয়াজ পড়ছেন নাকি!—দাদা পরকাল নিয়েই গেলেন। ইহকালটা তাঁর ভোগে এল না—কী ভাবছ দিলদার?

দিলদার। ভাবছিলাম জাঁহাপনা যে, মাছগুলোর ডানা না-থেকে যদি পাখা থাকত তাহলে সেগুলো বোধহয় উড়ত।

মোরাদ। আরে, মাছের যদি পাখা থাকত, তাহলে সে তো পাখিই হত।

দিলদার। তা বটে। ঐটুকু আগে ভাবিনি। তাই গোলে পড়েছিলাম। এখন বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে—আচ্ছা জাঁহাপনা, হাঁসের মতো জানোয়ার বড়-একটা দেখা যায় না। জলে সাঁতার দেয়, ডেঙ্গায় হাঁটে, আবার আকাশে ওড়ে।

মোরাদ। তার সঙ্গে বর্তমান বিষয়ের সম্বন্ধ কী মূর্খ!

দিলদার। দয়াময় পাদুটো নিচের দিকে দিয়েছিলেন হাঁটবার জন্য সেটা বেশ বোঝা যায়।

মোরাদ। যায় নাকি!

দিলদার। কিন্তু পা যদি ভাবতে শুরু করে তাহলে মাথা ঠিক রাখা শক্ত হয়।—আচ্ছা, ঈশ্বর পশুগুলোর মাথা সম্মুখদিকে আর লেজ পেছনদিকে দিয়েছেন কেন জাঁহাপনা?

মোরাদ। ওরে মূর্খ! তাদের মুখ যদি পিছনদিকে হত তাহলে তো সেইটেই সম্মুখ দিক হত।

দিলদার। ঠিক বলেছেন জাঁহাপনা।—কুকুর লেজ নাড়ে কেন, এর কারণ কিন্তু খাসা কারণ।

মোরাদ। কী কারণ?

দিলদার। কুকুর লেজ নাড়ে, কারণ লেজের চেয়ে কুকুরের জোর বেশি। যদি কুকুরের চেয়ে লেজের জোর বেশি হত, তাহলে লেজই কুকুরকে নাড়ত।

মোরাদ। হাঃ হাঃ হাঃ—এই যে দাদা!

ঔরংজীবের প্রবেশ

ঔরংজীব। এই যে এসেছ ভাই, তোমার বিদূষককে সঙ্গে করে এনেছ দেখছি।

মোরাদ। হাঁ দাদা। আমোদের সময় বয়স্যও চাই, নর্তকীও চাই!

ঔরংজীব। তা চাই বৈকি। কাল হঠাৎ জনকতক অসামান্য সুন্দরী নর্তকী এসে উপস্থিত হল। আমার তো তাতে স্পৃহা নেই জানোই। আমি তো মক্কায় চলেছি। তবে ভাবলাম তারা তোমার মনোরঞ্জন করতে পারবে! আর এই কয় বোতল সুরা তোমার জন্যে গোয়ার ফিরিঙ্গিদের কাছে সংগ্রহ করেছিলাম। দেখ দেখি কী রকম!

প্রদান

মোরাদ। দেখি! [ঢালিয়া পান করিয়া] বাহ্! তোফা! বাহ্ দিলদার কী ভাবছ! একটু খাবে?

দিলদার। আমি একটা কথা ভাবছিলাম জাঁহাপনা যে, সব জানোয়ারগুলোই সম্মুখদিকে হাঁটে কেন?

মোরাদ। কেন? পিছনদিকে হাঁটে না বলে?

দিলদার। না। কারণ তাদের চোখদুটো সম্মুখদিকে; কিন্তু যারা অন্ধ তাদের সম্মুখদিকে হাঁটাও যা পিছনদিকে হাঁটাও তা—একই কথা!

মোরাদ। তোফা! এই ফিরিঙ্গিরা মদটা খাসা তৈরি করে! [পান] তুমি একটু খাবে না?

ঔরংজীব। না, জানোই তো আমি খাই না। কোরানের নিষেধ।

দিলদার। অন্ধ জাগো—না কিবা রাত্রি কিবা দিন।

মোরাদ। কোরানের সব নিষেধ মানতে গেলে সংসার চলে না। [পান]

দিলদার। হাতির যতখানি শক্তি, ততখানি যদি বুদ্ধি থাকত, তো সে কী বুদ্ধিমান জানোয়ারই হত। তাহলে হাতির উপর মাহুত না-বসে মাহুতের উপর হাতি বসত! অতখানি শক্তি অতবড় দেহখানাকে—মায় শুঁড় নিয়ে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে—ওহ্।

ঔরংজীব। তোমার বিদূষকটি বেশ রসিক।

মোরাদ। ও একটি রত্ন। কই নর্তকীরা কই?

ঔরংজীব। ঐ যে ঐ শিবিরে। তুমি নিজে গিয়ে তাদের ডেকে নিয়ে এসো না!

মোরাদ। এক্ষণই। মোরাদ যুদ্ধে কি সম্ভোগে কিছুতেই পিছপাও নয়।

[প্রস্থান]

দিলদার। অন্ধ জাগো— [বলিয়া তাঁহার অনুগমন করিতে উদ্যত]

ঔরংজীব তাহাকে বাধা দিলেন

ঔরংজীব। দাঁড়াও কথা আছে।

দিলদার। আমায় মেরো না বাবা। আমি সিংহাসনও চাই না, মক্কাও চাই না।

ঔরংজীব। তুমি কে, ঠিক করে বলো! তুমি তো শুধু বিদূষক নও। কে তুমি?

দিলদার। আমি একজন বেজায় পুরানো গাঁটকাটা, ধাপ্পাবাজ, চোর। আমার স্বভাবটা হচ্ছে খোসামুদি, বাঁদরামি, জোচ্চোরি, পেজোমির একটা ঘণ্ট। আমি শামুকের চেয়ে কুঁড়ে, কুকুরের চেয়েও পা-চাটা, চড়ুইয়ের চেয়েও লম্পট।

ঔরংজীব। শোনো, আমি পরিহাসপ্রিয় নই। তুমি কী কাজ করতে পারো?

দিলদার। কিছু করতে পারি না। হাই তুলতে পারি, একটা কাজ দিলে সেটা পণ্ড করতে পারি, গালাগালি দিলে সেটা বুঝতে পারি—আর কিছু পারি না জাঁহাপনা।

ঔরংজীব। থাক—বুঝেছি। তোমাকে আমার দরকার হবে! কোনো ভয় নেই।

নর্তকীদের সহিত মোরাদের পুনঃপ্রবেশ

মোরাদ। বাহবা!—এ তোফা! চমৎকার।

ঔরংজীব। তবে তুমি এখন স্ফূর্তি করো। আমি যাই। তোমার বিদূষককে নিয়ে যাই। ওর কথাবার্তায় আমার ভারি আমোদ বোধ হচ্ছে।

মোরাদ। কেমন! হচ্ছে কিনা? বলেছি তো ও একটি রত্ন। তা বেশ ওকে নিয়ে যাও। আমি ওর চেয়ে অনেক ভালো সংসর্গ পেয়েছি।

[দিলদারের সহিত ঔরংজীবের প্রস্থান]

মোরাদ। নাচো, গাও।

নৃত্যগীত

আজি এসেছি—আজি এসেছি, এসেছি বঁধু হে
নিয়ে এই হাসি, রূপ গান।
আজি, আমার যা কিছু আছে,
এনেছি তোমার কাছে,
তোমায় করিতে সব দান!
আজি তোমার চরণতলে রাখি এ কুসুমভার,
এ হার তোমার গলে দিই বঁধু উপহার,
সুধার আধার ভরি, তোমার অধরে ধরি—
কর বঁধু কর তায় পান।
আজি হৃদয়ের সব আশা, সব সুখ ভালোবাসা,
তোমাতে হউক অবসান।
ঐ ভেসে আসে কুসুমিত উপবন সৌরভ,
ভেসে আসে উচ্ছল জলদল-কলরব
ভেসে আসে রাশি রাশি জোছনার মৃদুহাসি,
ভেসে আসে পাপিয়ার তান;
আজি এমন চাঁদের আলো—মরি যদি সেও ভালো;

সে মরণ স্বরগ সমান।
আজি তোমার চরণতলে লুটায়ে পড়িতে চাই,
তোমার জীবনতলে ডুবিয়ে মরিতে চাই,
তোমার নয়নতলে শয়ন লভিব বলে আসিয়াছি
তোমার নিধান;
আজি সব ভাষা সব যাক—নীরব হইয়া যাক;
প্রাণে শুধু মিশে থাক—প্রাণ।

মোরাদ শুনিতে শুনিতে সুরাপান করিতে লাগিলেন ও ক্রমে নিদ্রিত হইলেন

নর্তকীগণের প্রস্থান ও প্রহরিগণসহ ঔরংজীবের প্রবেশ

ঔরংজীব। বাঁধো।

মোরাদ। কে দাদা! এ কী! বিশ্বাসঘাতকতা?— [উঠিলেন]

ঔরংজীব। যদি বাধা দেয়—তবে বধ করতে দ্বিধা কোরো না।

প্রহরিগণ মোরাদকে বন্দি করিল

ঔরংজীব। আগ্রায় নিয়ে যাও। আমার পুত্র সুলতান আর শায়েস্তা খাঁর জিম্মায় রাখবে, আমি পত্র লিখে দিচ্ছি।

মোরাদ। এর প্রতিফল পাবে—আমি তোমায় একবার দেখব।

ঔরংজীব। নিয়ে যাও।

[সপ্রহরী মোরাদের প্রস্থান]

ঔরংজীব। আমার হাত ধরে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ খোদা! আমি এ সিংহাসন চাইনি। তুমি আমার হাত ধরে এ সিংহাসনে বসালে! কেন—তুমিই জানো।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—আগ্রার দুর্গপ্রাসাদ। কাল—প্রভাত।

সাজাহান একাকী

সাজাহান। সূর্য উঠেছে। যেমন সেই প্রথমদিন উঠেছিল, সেইরকম উজ্জ্বল রক্তবর্ণ। আকাশ তেমনি নীল; ঐ যমুনা তেমনি ক্রীড়াময়ী কলস্বরা; যমুনার পরপারে বৃক্ষরাজি তেমনি পত্রশ্যাম, পুষ্পোজ্জ্বল; যেমন আমি আশৈশব দেখে এসেছি। সবই সেই। কেবল আমিই বদলেছি—[গাঢ়স্বরে] আমি আজ আমার পুত্রের হস্তে বন্দি—নারীর মতো অসহায়, শিশুর মতো দুর্বল। মাঝে মাঝে ক্রোধে গর্জন করে উঠি, কিন্তু সে শরতের মেঘের গর্জন—একটা নিষ্ফল হাহাকার মাত্র। আমার নির্বিষ আস্ফালনে আমি নিজেই ক্ষয় হয়ে যাই। উহ্! ভারতসম্রাট সাজাহানের আজ এ কী অবস্থা! [একটি স্তম্ভের উপর বাহু

রাখিয়া দূরে যমুনার দিকে চাহিয়া রহিলেন]—ও কী শব্দ! ঐ ! আবার। আবার!—এই-যে জাহানারা।

জাহানারার প্রবেশ

সাজাহান। ও কী শব্দ জাহানারা? ঐ আবার!—শুনছিস? [সৌৎসুক্যে] দারা কি সৈন্য কামান নিয়ে বিজয়গর্বে আগ্রায় ফিরে এল? এসো পুত্র! এই অন্যায় অবিচার নৃশংসতার প্রতিশোধ নাও।—কী জাহানারা। চোখ ঢাকছিস যে! বুঝেছি মা—এ দারার বিজয় ঘোষণা নয়—এ নতুন এক দুঃসংবাদ! তাই কি?

জাহানারা। হাঁ বাবা!

সাজাহান। জানি দুর্ভাগ্য একা আসে না। যখন আরম্ভ হয়েছে, সে তার পালা শেষ না করে যাবে না। বলো কী দুঃসংবাদ কন্যা! ও কিসের শব্দ!

জাহানারা। ঔরংজীব আজ সম্রাট হয়ে দিল্লির সিংহাসনে বসেছে। আগ্রায় এ তারই উৎসবধ্বনি।

সাজাহান। [যেন শুনিতে পান নাই এইভাবে] কী! ঔরংজীব—কী করেছে?

জাহানারা। আজ, দিল্লির সিংহাসনে বসেছে।

সাজাহান। জাহানারা কী বলছ! আমি জীবিত আছি, না মরে গিয়েছি? ঔরংজীব—না—অসম্ভব! জাহানারা তুমি শুনতে ভুলেছ। এ কি হতে পারে! ঔরংজীব—ঔরংজীব এ-কাজ করতে পারে না। তার পিতা এখনও জীবিত—একটা তো বিবেক আছে, চক্ষুলজ্জা আছে!

জাহানারা। [কম্পিত স্বরে] যে ব্যক্তি বৃদ্ধ পিতাকে ছলে বন্দি করে—জীবন্তে এই গোর দিতে পারে, সে আর কী না করতে পারে বাবা!

সাজাহান। তবুও—না।—হবে।—আশ্চর্য কী! আশ্চর্য কী! এ কী! মাটি থেকে একটা কালো ধোঁয়া আকাশে উঠছে। আকাশ কালীবর্ণ হয়ে গেল! সংসার উল্টে গেল বুঝি।—ঐ—ঐ—না। আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি নাকি!—ঐ তো সেই নীল আকাশ, সেই উজ্জ্বল প্রভাত—হাসছে! কিছু হয়নি তো।—আশ্চর্য। [কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া] জাহানারা!

জাহানারা। বাবা!

সাজাহান। [গদ্‌গদস্বরে] তুই বাইরে কী দেখে এলি!—সংসার কি ঠিক সেই রকমই চলছে! জননী সন্তানকে স্তন দিচ্ছে? স্ত্রী স্বামীর ঘর করছে? ভৃত্য প্রভুর সেবা করছে? গৃহস্থ ভিখারিকে ভিক্ষা দিচ্ছে? দেখে এলি—যে বাড়িগুলো সেইরকম খাড়া আছে! রাস্তায় লোক চলছে! মানুষে মানুষ খাচ্ছে না! দেখে এলি! দেখে এলি!

জাহানারা। নীচ সংসার সেইরকমই চলছে বাবা! বন্দি সাজাহানকে নিয়ে কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না।

সাজাহান। না?—সত্য কথা?—তারা বলছে না যে, 'এ ঘোরতর অত্যাচার?' বলছে না—'আমাদের প্রিয় দয়ালু প্রজাবৎসল সাজাহানকে কার সাধ্য বন্দি করে রাখে?'—চেঁচাচ্ছে না যে—'আমরা বিদ্রোহ করব, ঔরংজীবকে

কারারুদ্ধ করব, আগ্রার দুর্গ-প্রাকার ভেঙে আমাদের সাজাহানকে নিয়ে এসে আবার সিংহাসনে বসাব?'—বলছে না? বলছে না?

জাহানারা। না বাবা! সংসার কাউকে নিয়ে ভাবে না। সবাই নিজের নিজের নিয়ে ব্যস্ত! তারা এত আত্মমগ্ন যে, কাল যদি এই সূর্য না উঠে, একটা প্রচণ্ড অগ্নিদাহ আকাশ পুড়িয়ে দিয়ে যায়, তো তারই রক্তবর্ণ আলোকে তারা পূর্ববৎ নিজের কাজ করে যাবে।

সাজাহান। যদি একবার দুর্গের বাইরে যেতে পারতাম—একবার সুযোগ পাই না জাহানারা! একবার আমাকে চুরি করে দুর্গের বাইরে নিয়ে যেতে পারিস?

জাহানারা। না বাবা! বাইরে সহস্র সতর্ক প্রহরী।

সাজাহান। তবু তারা একদিন আমাকে সম্রাট বলে মানত। আমি তাদের সঙ্গে কখনও শত্রুতা করিনি। হয়তো তাদের মধ্যে অনেককে অনাহার থেকে বাঁচিয়েছি, কারাগার থেকে মুক্ত করে দিয়েছি, বিপদ থেকে রক্ষা করেছি। বিনিময়ে—

জাহানারা। না বাবা!—মানুষ খোশামুদে—কুকুরের মতো খোশামুদে—যে একখণ্ড মাংস দিতে পারে, তারই পায়ের তলায় সে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়ে।—এত নীচ! এত হেয়!

সাজাহান। তবু আমি যদি তাদের কাছে গিয়ে একবার দাঁড়াই? এই শুভ্রশির মুক্ত করে, যষ্ঠির উপর এই রোগবিকম্পিত দেহখানির ভার রেখে যদি আমি তাদের সম্মুখে দাঁড়াই? তাদের দয়া হবে না? দয়া হবে না?

জাহানারা। বাবা সংসারে দয়ামায়া নাই। সব ভয়ে চলেছে। সাজাহানের সম্পৎকালে যারাই 'জয় সম্রাট সাজাহানের জয়' বলে চিৎকারে আকাশ দীর্ণ করে দিত, তারাই যদি আজ আপনার এই স্থবির অথর্ব মূর্তি দেখে, তো ঐ মুখে ঘৃণায় থুৎকার দেবে—আর যদি কৃপাভরে থুৎকার না দেয়, তো ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চলে যাবে!

সাজাহান। এতদূর? এতদূর!—[গম্ভীরস্বরে] যদি এই আজ সংসারের অবস্থা, তবে আজ এক মহাব্যাধি, তার সর্বস্ব ছেয়েছে; তবে আর কেন? ঈশ্বর আর তাকে রেখো না। এইক্ষণেই তাকে গলা টিপে মেরে ফেলো। যদি তাই হয়, তবে এখনও আকাশ—তুমি নীলবর্ণ কেন! সূর্য! তুমি এখনো আকাশের উপরে কেন? নির্লজ্জ! নেমে এসো! একটা মহাসংঘাতে তুমি চূর্ণ হয়ে যাও। ভূমিকম্প! তুমি ভৈরব-হুঙ্কারে জেগে উঠে এ পৃথিবীর বক্ষ ভেঙে খানখান করে ফেলো। একটা প্রকাণ্ড দাবানল জ্বলে উঠে সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে দিয়ে চলে যাও। আর একটা বিরাট ঘূর্ণি-ঝঞ্ঝা এসে সেই ভস্মরাশি ঈশ্বরের মুখে ছড়িয়ে দাও।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—রাজপুতনার মরুভূমির প্রান্তদেশ।
কাল—দ্বিপ্রহর দিবা।

বৃক্ষতলে দারা, নাদিরা ও সিপার—একপার্শ্বে নিদ্রিত জহরৎউন্নিসা

নাদিরা। আর পারি না প্রভু!—এইখানেই খানিক বিশ্রাম করো।

সিপার। হাঁ বাবা—উহ্ কী পিপাসা!

দারা। বিশ্রাম নাদিরা! এ সংসারে আমাদের বিশ্রাম নাই! ঐ মরুভূমি দেখছ—যা আমরা পার হয়ে এলাম? দেখছ নাদিরা!

নাদিরা। দেখছি—ওহ্—

দারা। আমাদের পেছনে যেমন মরুভূমি, আমাদের সম্মুখে সেইরূপ মরুভূমি! জল নাই, ছায়া নাই, শেষ নাই—ধু-ধু করছে।

সিপার। বাবা! বড় পিপাসা—একটু জল!

দারা। জল আর নেই সিপার!

সিপার। বাবা! জল! জল না-খেলে আমি বাঁচব না!

দারা। [রুদ্রভাবে] হুঁ!

সিপার। উহ্! জল! জল!

নাদিরা। দেখ প্রভু, কোনোখানে যদি একটু জল পাও দেখ! বাছার মূর্ছা যাবার উপক্রম হয়েছে। আমারও তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে—

দারা। কেবল তোমাদেরই বুঝি যাচ্ছে নাদিরা! আমার যাচ্ছে না? কেবল নিজের কথাই ভাবছ!

নাদিরা। আমার জন্য বলছি না নাথ!—এই বেচারি—আহা—

দারা। আমারও ভিতরে একটা দাহ! ভীষণ! আগুন ছুটছে। তর উপর বেচারির শুষ্ক তালু দেখছি—কথা সরছে না—দেখছি—আর ভাবছ কী নাদিরা—সে আমার পরম সুখ হচ্ছে! কিন্তু কী করব—জল নাই। এক ক্রোশের মধ্যে জলের দেখা নাই, চিহ্ন নাই। উহ্! কী অবস্থায়ই আমাকে ফেলেছ দয়াময়! আর-যে পারি না।

সিপার। আর পারি না বাবা!

নাদিরা। আহা বাছা—আমিও মরি—আর সহ্য হয় না—

দারা। মরো—তাই মরো—তোমরা মরো—আমিও মরি—আজ এইখানে আমাদের সব শেষ হয়ে যাক—তাই যাক!

সিপার। মা—ওহ্ আর কথা সরে না। কী যন্ত্রণা মা!

নাদিরা। উহ্ কী যন্ত্রণা!

দারা। না, আর দেখতে পারি না। আমি আজ ঈশ্বরের উপর প্রতিশোধ নেব। আর তাঁর এই পচা অন্তঃসারশূন্য সৃষ্টি কেটে ফেলে তাঁর প্রকাণ্ড

জোচ্চোরি বের করে দেখাব। আমি মরব; কিন্তু তার আগে নিজের হাতে তোদের শেষ করব! তোদের মরে মরব!

ছুরিকা বাহির করিলেন

সিপার। মাকে মেরো না—আমায় মারো!

নাদিরা। না না —আমায় আগে মারো—আমার চক্ষের সম্মুখে বাছার বুকে ছুরি দিতে পাবে না—আমায় আগে মারো।

সিপার। না, আমায় আগে মারো বাবা!

দারা। এ কী দয়াময়!—এ আবার—মাঝে মাঝে কী দেখাও! অন্ধকারের মাঝখানে মাঝে মাঝে এ কী আলোকের উচ্ছ্বাস! ঈশ্বর! দয়াময়! তোমার রচনা এমন সুন্দর অথচ এমন নিষ্ঠুর! এই মায়ের আর ছেলের পরস্পরকে রক্ষা করবার জন্য এই কান্না—অথচ কেউ কাউকে রক্ষা করতে পারছে না। এত প্রবল, কিন্তু এত দুর্বল। এত উচ্চ, কিন্তু এত নিচে পড়ে। এ যে আকাশের একখানা মাণিক মাটিতে ছটকে এসে পড়েছে। এ যে স্বর্গ আর নরক একসঙ্গে। এ কী প্রহেলিকা দয়াময়!

সিপার। বাবা বাবা—উহ্—[পড়িয়া গেল]

নাদিরা। বাছা আমার! [তাহাকে গিয়া ক্রোড়ে লইলেন]

দারা। এই আবার সেই নরক! না—না—না—এ আলোক-ভ্রান্তি, এ শয়তানি! এ ছল! অন্ধকার কত গাঢ় তাই দেখাবার জন্য এ এক জ্বলন্ত অঙ্গারখণ্ড। কিছু না। আমি তোমাদের বধ করে মরব! [জহরতের দিকে চাহিয়া] ও ঘুমোচ্ছে। ওটাকেও মারব। তার পরে—তোমাদের মৃতদেহগুলি জড়িয়ে আমি মরব।—এসো একে একে।

নাদিরাকে মারিবার জন্য ছুরিকা উত্তোলন

সিপার। মেরো না, মেরো না।

দারা। [সিপারকে এক হাতে ধরিয়া দূরে রাখিয়া নাদিরাকে ছুরি মারিতে উদ্যত] তবে।

নাদিরা। মরবার আগে আমাদের একবার প্রার্থনা করতে দাও।

দারা। প্রার্থনা!—কার কাছে? ঈশ্বরের কাছে? ঈশ্বর নাই। সব ভণ্ডামি! ধাপ্পাবাজি! ঈশ্বর নাই। কই কই! কে বললে ঈশ্বর আছেন? আছেন? ভালো! করো প্রার্থনা।

নাদিরা। আয় বাছা, মরবার আগে প্রার্থনা করি।

উভয়ে জানু পাতিয়া বসিলেন। চক্ষু মুদিত করিয়া রহিলেন।

নাদিরা। দয়াময়! বড় দুঃখে আজ তোমায় ডাকছি। প্রভু! দুঃখ দিয়েছ, দিয়েছ! তুমি যা দাও মাথা পেতে নেব! তবু—তবু—মরবার সময় যদি পুত্রকন্যাকে আর স্বামীকে সুখী দেখে মরতে পারতেম।

দারা। [দেখিতে দেখিতে সহসা জানু পাতিয়া বসিলেন] ঈশ্বর রাজাধিরাজ! তুমি আছ! তুমি না-থাকো তো এমন একটা বিশ্বজগৎকে চালাচ্ছে কে! কোথা থেকে সে নিয়ম এল, যার বলে এমন পবিত্র জিনিসদুটি জগতে প্রস্ফুটিত

হয়েছে—মা আর ছেলে! ঈশ্বর তোমাকে অনেকবার স্মরণ করেছি; কিন্তু এমন দুঃখে, এমন দীনভাবে, এমন কাতর হৃদয়ে, আর কখনো ডাকিনি। দয়াময়! রক্ষা করো!

গোরক্ষক ও গোরক্ষক-রমণীর প্রবেশ

গোরক্ষক। কে তোমরা?

দারা। এ কার স্বর [চক্ষু খুলিয়া] কে তোমরা! একটু জল দাও, একটু জল দাও!—আমায় না দাও—এই নারী আর এই বালককে দাও—

গোরক্ষক-রমণী। আহা বেচারিরা! আমি জল আনছি এখনি! একটু সবুর করো বাবা! [প্রস্থান]

গোরক্ষক। আহা! বাছা ধুঁকছে!

দারা। জহরৎ! জহরৎ মরে গিয়েছে!

গোরক্ষক। না মরেনি। বাছা আমার!

দারা। জহরৎ।

জহরৎ। [ক্ষীণস্বরে] বাবা!

রমণীর প্রবেশ ও জলদান এবং সকলের জলপান

গোরক্ষক-রমণী। এসো বাবা, আমাদের বাড়ি এসো।

গোরক্ষক। এসো বাবা!

দারা। কে তোমরা? তোমরা কি স্বর্গের দেবতা! ঈশ্বর পাঠিয়েছেন?

গোরক্ষক। না বাবা, আমি একজন রাখাল।—এ আমার স্ত্রী!

দারা। তাদের এত দয়া। মানুষের এত দয়া! এও কি সম্ভব!

গোরক্ষক। কেন বাবা! তোমরা কি কখনো মানুষ দেখনি! শয়তানই দেখে এসেছ?

দারা। তাই কি ঠিক? তারা কি সব শয়তান?

গোরক্ষক-রমণী। এ তো মানুষেরই কাজ বাবা। অনাথকে আশ্রয় দেওয়া, যে খেতে পায়নি তাকে খেতে দেওয়া, যে জল পায়নি তাকে জল দেওয়া— এ তো মানুষেরই কাজ বাবা। কেবল শয়তানই করে না। যদিও তারও যে তা মাঝে মাঝে করতে ইচ্ছা হয় না, তা বিশ্বাস করি না, এসো বাবা— [নিষ্ক্রান্ত]

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—মুঙ্গেরের দুর্গ—প্রাসাদমঞ্চ।
কাল—জোছনা রাত্রি।

পিয়ারা বেড়াইতে বেড়াইতে গাহিতেছেন

গীত

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।
সখি রে, কি মোর করমে লেখি
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু।
ভানুর কিরণ দেখি।

সুজার প্রবেশ

সুজা। তুমি এখানে! এদিকে আমি খুঁজে খুঁজে সারা।

পিয়ারার গীত চলিল

নিচল ছাড়িয়া উঁচলে উঠিতে
পড়িনু অগাধ জলে।

সুজা। তারপরে তোমার স্বর শুনে বুঝলাম যে তুমি এখানে।

পিয়ারার গীত চলিল

লছমি চাহিতে দারিদ্র্য বেঢ়ল
মাণিক হারানু হেলে।

সুজা। শোনো কথা—আহ্—

পিয়ারার গীত চলিল

পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু
বজর পড়িয়া গেল।

সুজা। শুনবে না? আমি চললাম!

পিয়ারার গীত চলিল

জ্ঞানদাস কহে, কানুর পীরিতি,
মরণ অধিক শেল।

সুজা। আহ্ জ্বালাতন করলে। কেউ যেন দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ না করে। স্বামীগুলোকে পেয়ে বসে। প্রথমপক্ষের হলে তোমাকে কি একটা কথা শোনবার জন্য এত সাধতাম!

পিয়ারা। আহ্ আমার এমন কীর্তনটা মাটি করে দিলে! সংসারে কেউ যেন না দোজবরে বিয়ে করে। নইলে কেউ এমন কীর্তনটা মাটি করে! আহ্ জ্বালাতন করলে! দিবারাত্রি যুদ্ধের সংবাদ শুনতে হবে! তার উপর না-জানো ব্যাকরণ, না-বোঝো গান। জ্বালাতন।

সুজা। গান বুঝিনে কীরকম!

পিয়ারা। এমন কীর্তনটা! আহা হা হা!

সুজা। তুমি যে নিজে গেয়ে নিজেই মোহিত!

পিয়ারা। কী করি, তুমি তো বুঝবে না! তাই আমি নিজেই গায়িকা নিজেই শ্রোতা।

সুজা। ব্যাকরণ ভুল।

পিয়ারা। কী রকম?

সুজা। শ্রোতা হবে না—শ্রোত্রী।

পিয়ারা। [থতমত খাইয়া] তবেই তো মাটি করেছে।

সুজা। এখন কথা হচ্ছে এই যে সোলেমান মুঙ্গের দুর্গ ছেড়ে চলে গিয়েছে কেন তা জানো?

পিয়ারা। তাই তো!

সুজা। তার বাপ তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। অথচ এদিকে—

পিয়ারা। তা ওরকম হয়! অশুদ্ধ হয়নি!

সুজা। দারা দুইবারই যুদ্ধে ঔরংজীবের দ্বারা পরাজিত হয়েছেন।

পিয়ারা। ব্যাকরণ ভুল হয়নি।

সুজা। তুমি কথাটা শুনবে না?

পিয়ারা। আগে স্বীকার করো যে আমার ব্যাকরণ ভুল হয়নি।

সুজা। আলবৎ হয়েছে।

পিয়ারা। আলবৎ হয়নি।

সুজা। চলো—কাকে জিজ্ঞাসা করবে করো।

পিয়ারা। দেখ, আপোষে মেটাও বলছি, নইলে আমি এই নিয়ে রসাতল করব। সারারাত এমনি চেঁচাব যে, দেখি তুমি কেমন ঘুমাও। আপোষে মেটাও!

সুজা। তাহলে আমার বক্তব্যটা শুনবে?

পিয়ারা। শুনব।

সুজা। তবে তোমার ব্যাকরণ ভুল হয়নি। বিশেষ যখন তুমি দ্বিতীয় পক্ষ। এখন শোনো, বিশেষ কথা আছে। গুরুতর! তোমার কাছে পরামর্শ চাই।

পিয়ারা। চাও নাকি? তবে রোস, আমি প্রস্তুত হয়ে নেই। [চেহারা ও পোশাক ঠিক করিয়া লইয়া] এখানে একটা উঁচু আসনও নেই ছাই। যাক্—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শুনব। বলো। আমি প্রস্তুত।

সুজা। আমার বিশ্বাস যে পিতা মৃত।

পিয়ারা। আমারও তাই বিশ্বাস।

সুজা। জয়সিংহ আমাকে সম্রাটের যে-দস্তখত দেখিয়েছিলেন—সে দস্তখত দারার জাল।

পিয়ারা। নিশ্চয়ই—

সুজা। স্বীকার করছ?

পিয়ারা। স্বীকার আমি কিছু করছি না। বলে যাও।

সুজা। দ্বিতীয় যুদ্ধে ঔরংজীবের হাতে দারার পরাজয় হয়েছে শুনেছ?

পিয়ারা। শুনেছি।

সুজা। কার কাছে শুনলে?

পিয়ারা। তোমার কাছে।
সুজা। কখন?
পিয়ারা। এখনই!
সুজা। তারা আগ্রা ছেড়ে পালিয়েছে। আর ঔরংজীব বিজয়গর্বে আগ্রায় প্রবেশ করে পিতাকে বন্দি করেছে, আর মোরাদকেও কারারুদ্ধ করেছে।
পিয়ারা। বটে!
সুজা। ঔরংজীব এখন আমার সঙ্গে যুদ্ধে নামবে।
পিয়ারা। খুব সম্ভব।
সুজা। আর ঔরংজীবের সঙ্গে যদি আমার যুদ্ধ হয়— তো সে বেশ একটু শক্তরকম যুদ্ধ হবে।
পিয়ারা। শক্ত বলে শক্ত!
সুজা। আমার তার জন্যে এখন থেকেই প্রস্তুত হতে হয়।
পিয়ারা। তা হয় বৈকি!
সুজা। কিন্তু—
পিয়ারা। আমরও ঠিক ঐ মত—ঐ কিন্তু—
সুজা। তুমি যে কী বলছ তা আমি বুঝতে পারছিনে।
পিয়ারা। সত্যি কথা বলতে কী সেটা আমিও বড় একটা পারছিনে।
সুজা। দূর—তোমার কাছে পরামর্শ চাওয়াই বৃথা।
পিয়ারা। সম্পূর্ণ।
সুজা। যুদ্ধের বিষয় তুমি কী বুঝবে?
পিয়ারা। আমি কী বুঝব?
সুজা। কিন্তু এদিকে আবার একটা মুশকিল হয়েছে।
পিয়ারা। সে মুশকিলটা কীরকম?
সুজা। মহম্মদ তো আমায় স্পষ্ট লিখেছে যে সে আমার কন্যাকে বিবাহ করবে না।
পিয়ারা। তা কী করে করবে?
সুজা। কেন করবে না? আমার কন্যার সঙ্গে তার বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক হয়েছে। এখন কথা ফিরিয়ে নিলে কি চলে?
পিয়ারা। ওমা তা কি চলে?
সুজা। কিন্তু সে এখন বিবাহ করতে চায় না।
পিয়ারা। তা তো চাইবেই না।
সুজা। লিখেছে যে তার পিতৃশত্রুর কন্যাকে সে বিবাহ করবে না!
পিয়ারা। তা কী করে করবে!
সুজা। কিন্তু তাতে আমার মেয়ে যে এদিকে বিষম দুঃখিত হবে।
পিয়ারা। তা হবে বৈকি! তা আর হবে না!
সুজা। আমি যে কী করি—কিছুই বুঝতে পারছিনে।
পিয়ারা। আমিও পারছিনে!

সুজা। এখন কী করা যায়!

পিয়ারা। তাই তো!

সুজা। তোমার কাছে কোনো বিষয়ে উপদেশ চাওয়া বৃথা।

পিয়ারা। বুঝেছ? কেমন করে বুঝলে? হ্যাঁগা কেমন করে বুঝলে? কী বুদ্ধি?

সুজা। এখন কী করি! ঔরংজীবের সঙ্গে যুদ্ধ। তার সঙ্গে তার বীর পুত্র মহম্মদ। মহাসমস্যার কথা। তাই ভাবছি। তুমি কী উপদেশ দাও?

পিয়ারা। প্রিয়তম! আমার উপদেশ শুনবে? শোনো তো বলি?

সুজা। বলো, শুনি।

পিয়ারা। তবে শোনো, আমি উপদেশ দেই, যুদ্ধে কাজ নাই।

সুজা। কেন?

পিয়ারা। কী হবে সাম্রাজ্যে নাথ? আমাদের কিসের অভাব? চেয়ে দেখ এই শস্যশ্যামলা, পুষ্পভূষিতা, সহস্র-নির্ঝরঝঙ্কৃত অমরাবতী—এই বঙ্গভূমি। কিসের সাম্রাজ্য! আর আমার হৃদয়-সিংহাসনে তোমায় বসিয়ে রেখেছি, তার কাছে কিসের সেই ময়ূর সিংহাসন? যখন আমরা এই প্রাসাদশিখরে দাঁড়িয়ে—করে কর, বক্ষে বক্ষ—বিহঙ্গমের ঝঙ্কার শুনি, ঐ গঙ্গার দিগন্তপ্রসারিত ধূসর বক্ষ দেখি, ঐ অনন্ত নীল-আকাশের উপর দিয়ে আমাদের মিলিত মুগ্ধদৃষ্টির নৌকা ভাসিয়ে দিয়ে চলে যাই—সেই নীলিমার এক নিভৃত প্রান্তে কল্পনা দিয়ে একটি মোহময় শান্তিময় দ্বীপ সৃষ্টি করি, আর তার মধ্যে এক স্বপ্নময় কুঞ্জে বসে পরস্পরের দিকে চেয়ে পরস্পরের প্রাণ পান করি—তখন মনে হয় না নাথ, যে কিসের ঐ সাম্রাজ্য? নাথ! এ যুদ্ধে কাজ নাই! হয়তো যা আমাদের নাই তা পাব না; যা আছে তা হারাব।

সুজা। তবেই তো তুমি ভাবিয়ে দিলে! একেই ভেবে ভেবে আমার মাথা গরম হয়েছে, তার উপর—না, দারার প্রভুত্ব বরং মানতে পারতাম। ঔরংজীবের—আমার ছোটভাই-এর প্রভুত্ব—কখনো স্বীকার করব না—না কখনো না।

[প্রস্থান]

পিয়ারা। তোমায় উপদেশ দেওয়া বৃথা! বীর তুমি! সাম্রাজ্যের জন্য তুমি যদিও যুদ্ধ না করতে, যুদ্ধ করবার জন্য তুমি যুদ্ধ করবে। তোমায় আমি বেশ চিনি—যুদ্ধের নামে তুমি নাচো।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—দিল্লিতে দরবারকক্ষ। কাল—প্রাহ্ন।

সিংহাসনারূঢ় ঔরংজীব। পার্শ্বে মীরজুমলা, শায়েস্তা খাঁ ইত্যাদি।

সৈন্যাধ্যক্ষগণ, অমাত্যবর্গ, জয়সিংহ ও দেহরক্ষী, সম্মুখে যশোবন্ত সিংহ।

যশোবন্ত। জাঁহাপনা! আমি এসেছিলাম—সুলতান সুজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জাঁহাপনাকে আমার সৈন্য সাহায্য দিতে; কিন্তু এখানে এসে আমার আর সে প্রবৃত্তি নাই। আমি আজ যোধপুরে যাচ্ছি।

ঔরংজীব। মহারাজ যশোবন্ত সিংহ! আপনি নর্মদাযুদ্ধে দারার পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন বলে আমার অপ্রীতিভাজন নহেন। মহারাজের রাজভক্তির নিদর্শন পেলে আমরা মহারাজকে আত্মীয় বলে গণ্য করব।

যশোবন্ত। যশোবন্ত সিংহ জাঁহাপনার অপ্রীতিভাজন হোক কি প্রীতিভাজন হোক, তাতে তার কিছুমাত্র যায় আসে না! আর আমি আজ এ-সভায় জাঁহাপনার দয়ার ভিখারি হয়ে আসি নাই।

ঔরংজীব। তবে এখানে আসা মহারাজের উদ্দেশ্য?

যশোবন্ত। উদ্দেশ্য একবার আপনাকে জিজ্ঞাসা করা যে, কী অপরাধে আমাদের দয়ালু সম্রাট সাজাহান আজ বন্দি; আর কী স্বত্বে আপনি পিতা বর্তমানে তাঁর সিংহাসনে বসেছেন।

ঔরংজীব। তার কৈফিয়ৎ কি আমায় এখন মহারাজকে দিতে হবে?

যশোবন্ত। দেওয়া না-দেওয়া আপনার ইচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করতে এসেছি মাত্র।

ঔরংজীব। কী উদ্দেশ্যে?

যশোবন্ত। জাঁহাপনার উত্তরের উপর আমার ভবিষ্যৎ আচরণ নির্ভর করছে।

ঔরংজীব। কিরূপ? কৈফিয়ৎ যদি না দিই?

যশোবন্ত। তাহলে বুঝব জাঁহাপনার দেওয়ার মতো কৈফিয়ৎ কিছু নাই।

ঔরংজীব। আপনার যেরূপ ইচ্ছা বুঝুন, তাতে ঔরংজীবের কিছু যায় আসে না। ঔরংজীব তার কার্যাবলির জন্য এক খোদার কাছে ভিন্ন আর কারো কাছে কৈফিয়ৎ দেয় না।

যশোবন্ত। উত্তম! তবে খোদার কাছেই কৈফিয়ৎ দিবেন।

গমনোদ্যত

ঔরংজীব। দাঁড়ান মহারাজ! আমার কৈফিয়ৎ না-পেলে আপনি কী করবেন?

যশোবন্ত। সাধ্যমতো চেষ্টা করব সম্রাট সাজাহানকে মুক্ত করতে—এই মাত্র। পারি, না পারি, সে স্বতন্ত্র কথা; কিন্তু আমার কর্তব্য আমি করব।

ঔরংজীব। বিদ্রোহ করবেন?

যশোবন্ত। বিদ্রোহ! সম্রাটের পক্ষে যুদ্ধ করার নাম বিদ্রোহ নয়। বিদ্রোহ করেছেন আপনি। আমি সেই বিদ্রোহীর শাসন করব—যদি পারি।

ঔরংজীব। মহারাজ, এতক্ষণ ধরে পরীক্ষা করছিলাম যে আপনার স্পর্ধা কতদূর উঠে। পূর্বে শুনেছিলাম, এখন দেখছি—আপনি নির্ভীক। মহারাজ! ভারতসম্রাট ঔরংজীব যোধপুরাধিপতি যশোবন্ত সিংহের শত্রুতায় ভয় করে না। সমরক্ষেত্রে আর-একবার ঔরংজীবের পরিচয় চান, পাবেন।—বুঝেছি, নর্মদাযুদ্ধে ঔরংজীবের সঙ্গে মহারাজের সম্যক পরিচয় হয় নাই।

যশোবন্ত। নর্মদার যুদ্ধ জাঁহাপনা! আপনি সেই জয়ের গৌরব করেন? যশোবন্ত সিংহ অনুকম্পাভরে আপনার পথশ্রান্ত হীনবল সৈন্য আক্রমণ করে নাই। নইলে আমার সৈন্যের শুদ্ধ মিলিত নিশ্বাসে ঔরংজীব সসৈন্যে উড়ে যেতেন। এতখানি অনুকম্পার বিনিময়ে যশোবন্ত সিংহ ঔরংজীবের

শাঠ্যের জন্য প্রস্তুত ছিল না। এই তার অপরাধ। সেই জয়ের গৌরব করছেন জাঁহাপনা।

ঔরংজীব। মহারাজ যশোবন্ত সিংহ! সাবধান! ঔরংজীবেরও ধৈর্যের সীমা আছে। সাবধান!

যশোবন্ত। সম্রাট! চোখ রাঙাচ্ছেন কাকে? চোখ রাঙিয়ে জয়সিংহের মতো ব্যক্তিকে শাসন করে রাখতে পারেন! যশোবন্ত সিংহের প্রকৃতি অন্য ধাতু দিয়ে গড়া জানবেন! যশোবন্ত সিংহ জাঁহাপনার রক্তবর্ণ চক্ষু আর অগ্নিময় গোলাকে সমানই তুচ্ছ জ্ঞান করে।

মীরজুমলা। মহারাজ! এ কী স্পর্ধা!

যশোবন্ত। স্তব্ধ হও মীরজুমলা! রাজায় রাজায় যুদ্ধ, তখন বন্যশৃগাল মধ্যে এসে দাঁড়ায় কী হিসাবে? আমরা এখনও কেউ মরিনি। তোমাদের সময় যুদ্ধের পরে—তুমি আর এই শায়েস্তা খাঁ—

শায়েস্তা খাঁ ও মীরজুমলা তরবারি বাহির করিলেন ও কহিলেন—'সাবধান কাফের!'

শায়েস্তা। আজ্ঞা দিউন জাঁহাপনা!

ঔরংজীব ইঙ্গিতে নিষেধ করিলেন

যশোবন্ত। বেশ জুড়ি মিলেছে—মীরজুমলা আর এই শায়েস্তা খাঁ—উজির আর সেনাপতি। দুই নেমকহারাম। যেমন প্রভু তেমনি ভৃত্য।

শায়েস্তা। আস্পর্ধা এই কাফেরের জাঁহাপনা—যে ভারতসম্রাটের সম্মুখে—

যশোবন্ত। কে ভারতসম্রাট?

শায়েস্তা। ভারতের সম্রাট—বাদশাহ গাজী আলমগীর!

অবগুণ্ঠিতা জাহানারার প্রবেশ

জাহানারা। মিথ্যা কথা, ভারতের সম্রাট ঔরংজীব নয়। ভারতের সম্রাট শাহানশাহ সাজাহান।

মীরজুমলা। কে এ নারী!

জাহানারা। কে এ নারী? এ নারী সম্রাট সাজাহানের কন্যা জাহানারা। [মুখ উন্মুক্ত করিলেন]—কী ঔরংজীব! তোমার মুখ সহসা ছাইয়ের মতো শাদা হয়ে গেল যে।

ঔরংজীব। তুমি এখানে ভগ্নী!

জাহানারা। আমি এখানে কেন—এ-কথা ঔরংজীব, আজ ঐ সিংহাসনে ধীরভাবে বসে মানুষের স্বরে জিজ্ঞাসা করতে পারছ? আমি এখানে এসেছি ঔরংজীব, তোমাকে মহারাজদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত করতে।

ঔরংজীব। কার কাছে?

জাহানারা। ঈশ্বরের কাছে। ঈশ্বর নাই ভেবেছ ঔরংজীব। শয়তানের চাকরি করে ভেবেছ যে ঈশ্বর নাই? ঈশ্বর আছেন।

ঔরংজীব। আমি এখানে বসে সেই খোদারই ফকিরি করছি—

জাহানারা। স্তব্ধ হও ভণ্ড! খোদার পবিত্র নাম তোমার জিহ্বায় উচ্চারণ কোরো না। জিহ্বা পুড়ে যাবে। বজ্র ও ঝঞ্ঝা, ভূমিকম্প ও জলোচ্ছ্বাস অগ্নিদাহ ও

মড়ক—তোমরা তো লক্ষ লক্ষ নিরীহ নরনারীর ঘর উড়িয়ে পুড়িয়ে ভাসিয়ে ভেঙেচুরে চলে যাও। শুধু এদেরই কিছু করতে পারো না!

ঔরংজীব। মহম্মদ! এ উন্মাদিনী নারীকে এখান থেকে নিয়ে যাও!—এ—রাজসভা, উন্মাদাগার নয়—মহম্মদ।

জাহানারা। দেখি, এই সভাস্থলে কার সাধ্য যে সম্রাট সাজাহানের কন্যাকে স্পর্শ করে। সে ঔরংজীবের পুত্রই হোক, আর স্বয়ং শয়তানই হোক।

ঔরংজীব। মহম্মদ! নিয়ে যাও।

মহম্মদ। মার্জনা করবেন পিতা। সে স্পর্ধা আমার নেই।

যশোবন্ত। বাদশাহজাদীর প্রতি রূঢ় আচরণ আমরা সহ্য করব না!

অন্য সকলে। কখনই না।

ঔরংজীব। সত্য বটে! আমি ক্রোধে কি জ্ঞান হারিয়েছি! নিজের ভগ্নীর—সম্রাট সাজাহানের কন্যার প্রতি এই রূঢ় ব্যবহার করবার আজ্ঞা দিচ্ছি! ভগ্নি, অন্তঃপুরে যাও! এ প্রকাশ্য দরবারে, শত কুৎসিত দৃষ্টির সম্মুখে এসে দাঁড়ানো সম্রাট সাজাহানের কন্যার শোভা পায় না। তোমার স্থান অন্তঃপুর।

জাহানারা। তা জানি ঔরংজীব; কিন্তু যখন একটা প্রকাণ্ড ভূমিকম্পে হর্ম্যরাজি ভেঙে পড়ে, তখন অসূর্যম্পশ্যরূপা মহিলা যে—সেও নিঃসঙ্কোচে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। আজ ভারতবর্ষের সেই অবস্থা। আজ একটা বিরাট অত্যাচারে একটা সাম্রাজ্য ভেঙে পড়েছে। এখন আর সে নিয়ম খাটে না। আজ যে অন্যায়-নীতির মহাবিপ্লব, যে দুর্বিষহ অত্যাচার—ভারতবর্ষের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়ে যাচ্ছে, তা এর পূর্বে বুঝি কুত্রাপি হয় নাই। এতবড় পাপ, এতবড় শাঠ্য, আজ ধর্মের নামে চলে যাচ্ছে। আর মেষশাবকগণ শুদ্ধ অনিমেষ নেত্রে তার পানে চেয়ে আছে! ভারতবর্ষের মানুষগুলো কি আজ শুদ্ধ চাবুকে চলেছে? দুর্নীতির প্লাবনে কি ন্যায়, বিবেক, মনুষ্যত্ব—মানুষের যা-কিছু উচ্চপ্রবৃত্তি সব ভেসে গিয়েছে? এখন নীচ স্বার্থসিদ্ধিই কি মানুষের ধর্মনীতি? সৈন্যাধ্যক্ষগণ! অমাত্যগণ! সভাসদগণ! তোমাদের সম্রাট সাজাহান জীবিত থাকতে তোমরা কী স্পর্ধায় তাঁর সিংহাসনে তাঁর পুত্র ঔরংজীবকে বসিয়েছ আমি জানতে চাই।

ঔরংজীব। আমার ভগ্নী যদি এখান থেকে যেতে অস্বীকৃত হন, সভাসদগণ, আপনারা বাইরে যান! সম্রাটের কন্যার মর্যাদা রক্ষা করুন।

সকলে বাহিরে যাইতে উদ্যত

জাহানারা। দাঁড়াও! আমার আজ্ঞা—দাঁড়াও! আমি এখানে তোমাদের কাছে নিষ্ফল ক্রন্দন করতে আসিনি। আমি নিজের কোনো দুঃখও তোমাদের কাছে নিবেদন করতে আসিনি! আমি নারীর লজ্জা, সঙ্কোচ, সম্ভ্রম ত্যাগ করে এসেছি—আমার বৃদ্ধ পিতার জন্য। শোনো!

সকলে। আজ্ঞা করুন।

জাহানারা। আমি একবার মুখোমুখি তোমাদের জিজ্ঞাসা করতে এসেছি যে, তোমরা তোমাদের সেই বীর, দয়ালু প্রজাবৎসল সম্রাট সাজাহানকে চাও? না, এই ভণ্ড পিতৃদ্রোহী, পরস্বাপহারী ঔরংজীবকে চাও? জেনো, এখনও ধর্ম লুপ্ত হয়নি। এখনও চন্দ্র সূর্য উঠছে। এখনও পিতা পুত্রের সম্বন্ধ আছে। আজ কি একদিনে একজনের পাপে তা উল্টে যাবে? তা হয় না। ক্ষমতা কি এত দৃপ্ত হয়েছে যে তার বিজয়-দুন্দুভি তপোবনের পবিত্র শান্তি লুটে নেবে? অধর্মের আস্পর্ধা এত বেশি হয়েছে যে, সে নির্বিরোধে স্নেহ দয়া ভক্তির বক্ষের উপর দিয়ে তার রক্তাক্ত শকট চালিয়ে যাবে?—বলো। তোমরা ঔরংজীবের ভয় করছ? কে ঔরংজীব? তার দুই ভুজে কত শক্তি? তোমরাই তার বল। তোমরা ইচ্ছে করলে তাকে ওখানে রাখতে পারো; ইচ্ছা করলে তাকে ওখান থেকে টেনে এনে পঙ্কে নিক্ষেপ করতে পারো। তোমরা যদি সম্রাট সাজাহানকে এখনও ভালোবাসো, সিংহ স্থবির বলে তাকে পদাঘাত করতে না চাও, তোমরা যদি মানুষ হও তো বলো সমস্বরে : 'জয় সম্রাট সাজাহানের জয়!' দেখবে ঔরংজীবের হাত থেকে রাজদণ্ড খসে পড়ে যাবে!

সকলে। জয় সম্রাট সাজাহানের জয়—

জাহানারা। উত্তম, তবে—

ঔরংজীব। (সিংহাসন হইতে নামিয়া) উত্তম! তবে এই মুহূর্তে আমি সিংহাসন ত্যাগ করলাম! সভাসদগণ! পিতা সাজাহান রুগ্ণ, শাসনে অক্ষম। তিনি যদি শাসনক্ষম হতেন, তাহলে আমার দাক্ষিণাত্য ছেড়ে এখানে আসার প্রয়োজন ছিল না। আমি রাজ্যের রশ্মি সাজাহানের হাত থেকে নিই নাই—দারার হাত থেকে নিয়েছি। পিতা পূর্ববৎ সুখে স্বচ্ছন্দে আগ্রার প্রাসাদে আছেন। আপনাদের যদি এই ইচ্ছা হয় যে, দারা সম্রাট হোন, বলুন আমি তাঁকে ডেকে পাঠাচ্ছি। দারা কেন? যদি মহারাজ যশোবন্ত সিংহ এই সিংহাসনে বসতে চান, যদি তিনি বা মহারাজ জয়সিংহ বা আর কেউ শাসনের মহাদায়িত্ব নিতে প্রস্তুত থাকেন—আমার আপত্তি নাই। একদিকে দারা, অন্যদিকে সুজা, আর একদিকে মোরাদ, এই শত্রু ঘাড়ে করে সিংহাসনে বসতে চান, বসুন। আমার বিশ্বাস ছিল যে, আপনাদের সম্মতিক্রমে ও অনুরোধে আমি এখানে বসেছি। মনে করবেন না যে, এ সিংহাসন আমার পুরস্কার। এ আমার শাস্তি! আমি আজ সিংহাসনের উপর বসে নাই, বারুদের স্তূপের উপর বসে আছি। তার উপর এর জন্য আমি মক্কায় যাবার সুখ থেকে বঞ্চিত আছি। আপনাদের যদি ইচ্ছে হয় যে, দারা সিংহাসনে বসুন, হিন্দুস্থান আবার অরাজক ধর্মহীন হোক, আমি আজই মক্কায় যাচ্ছি। সে তো আমার পরম সুখ। বলুন—

সকলে নিস্তব্ধ রহিল

ঔরংজীব। এই আমি আমার রাজমুকুট সিংহাসনের পদতলে রাখলাম। আমি এ সিংহাসনে বসেছি আজ—সম্রাটের নামে—কিন্তু তাও বেশিদিনের জন্য

নয়! সাম্রাজ্যে শান্তি স্থাপন করে দারার বিশৃঙ্খল রাজত্বে শৃঙ্খলা এনে, পরে আপনারা যার হাতে বলেন, তার হাতে রাজ্য ছেড়ে দিয়ে, আমি সেই মক্কায়ই যেতে চাই। আমি এখানে বসেও সেই দিকেই চেয়ে আছি— আমার জাগ্রতে চিন্তা, নিদ্রায় স্বপ্ন, জীবনের ধ্যান—সেই মহাতীর্থের দিকেই চেয়ে আছি! আপনাদের যদি এই ইচ্ছা হয়, আমি আজই রাজ্যের রশ্মি ছেড়ে দিয়ে মক্কায় চলে যাই। সে তো আমার পরম সৌভাগ্য। আমার জন্য ভাববেন না। আপনারা নিজেদের দিকে চেয়ে বলুন যে পীড়ন চান, না শাসন চান? বলুন। আমি আপনাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শাসনদণ্ড গ্রহণ করতে পারব না, আর আপনাদের ইচ্ছাক্রমেও এখানে দাঁড়িয়ে দারার উচ্ছৃঙ্খল অত্যাচার দেখতে পারব না। বলুন, আপনাদের কী ইচ্ছা!—চলো মহম্মদ! মক্কায় যাবার জন্য প্রস্তুত হও—বলুন, আপনাদের কী অভিপ্রায়?

সকলে। জয় সম্রাট ঔরংজীবের জয়—

ঔরংজীব। উত্তম! আপনাদের অভিমত জানলাম। এখন আপনারা বাইরে যান। আমার ভগ্নীর—সাজাহানের কন্যার অমর্যাদা করবেন না।

[ঔরংজীব ও জাহানারা ভিন্ন সকলের প্রস্থান]

জাহানারা। ঔরংজীব।

ঔরংজীব। ভগ্নী!

জাহানারা। চমৎকার! আমি প্রশংসা করে থাকতে পারছি না। এতক্ষণ আমি বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে ছিলাম; তোমার ভেলকি দেখছিলাম। যখন চমক ভাঙল তখন সব হারিয়ে বসে আছি! চমৎকার।

ঔরংজীব। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আল্লার নামে শপথ করছি, যে, আমি যতদিন সম্রাট আছি, তোমার আর পিতার কোনো অভাব হবে না!

জাহানারা। আবার বলি—চমৎকার!

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—খিজুয়ায় ঔরংজীবের শিবির। কাল—রাত্রি

ঔরংজীব একখণ্ড পত্রিকা হস্তে লইয়া দেখিতেছিলেন

ঔরংজীব। কিস্তি। না গজ দিয়ে ঢেকে দেবে। আচ্ছা—না। ওঠসাই কিস্তিতে আমার দাবা যাবে! কিন্তু—দেখি—উঁহু! আচ্ছা এই গজের কিস্তি—চেপে দেবে। তার পর—এই কিস্তি। এই পদ। তার পর এই কিস্তি। কোথায় যাবে! মাৎ। [সোৎসাহে] মাৎ [পরিক্রমণ]

মীরজুমলার প্রবেশ

ঔরংজীব। আমরা এ যুদ্ধে জিতেছি উজির সাহেব!

মীরজুমলা। সে কী জাঁহাপনা!

ঔরংজীব। প্রথম, কামান চালাবেন আপনি। তার পরে আমি হাতি নিয়ে সেই চকিত সৈন্যের উপর পড়ব। তার পরে মহম্মদের অশ্বারোহী। এই তিন কিস্তিতে মাৎ।

মীরজুমলা। আর যশোবন্ত সিংহ?

ঔরংজীব। তার উপর এবার তত নির্ভর করি না। তাকে চোখে চোখে রাখতে হবে—আমাদের আর সুজার সৈন্যের মধ্যে—অনিষ্ট না করতে পারে! তার পশ্চাৎ থাকবে তোমার কামান! আমি আর মহম্মদ তার দুই পাশে থাকব। বিপক্ষের আক্রমণ হবে প্রধানত যশোবন্তের রাজপুত সৈন্যের উপর। তারা যুদ্ধ করে ভালো; নইলে পিছনে তোমার কামান রইল। তা যায়—দাবা যাক। আমরা জয়লাভ করব। তবে কাল প্রত্যুষে প্রস্তুত থাকবেন—এখন যেতে পারেন।

মীরজুমলা। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান]

ঔরংজীব। যশোবন্ত সিংহ! এটা শুদ্ধ পরীক্ষা।

মহম্মদের প্রবেশ

ঔরংজীব। মহম্মদ! তোমার স্থান হচ্ছে সম্মুখে, যশোবন্ত সিংহের দক্ষিণে। তুমি সব শেষে আক্রমণ করবে। শুদ্ধ প্রস্তুত থাকবে। এই দেখ নকশা। [মহম্মদ দেখিলেন]

ঔরংজীব। বুঝলে?

মহম্মদ। হাঁ পিতা।

ঔরংজীব। আচ্ছা যাও। কাল প্রত্যূষে।

[মহম্মদের প্রস্থান।

ঔরংজীব। সুজার লক্ষ সৈন্য অশিক্ষিত! বেশি কষ্ট পেতে হবে না বোধহয়। একবার ছত্রভঙ্গ করতে পারলে হয়।—এই যে মহারাজ!

দিলদারের সহিত যশোবন্ত সিংহ প্রবেশ করিয়া কুর্নিশ করিলেন

ঔরংজীব। মহারাজ! আপনাকে একবার ডেকে পাঠিয়েছিলাম। আমি অনেক ভেবে সমস্ত সৈন্যের পুরোভাগে আপনাকে দিলাম।

যশোবন্ত। আমাকে?

ঔরংজীব। তাতে আপত্তি আছে?

যশোবন্ত। না, আপত্তি নাই।

ঔরংজীব। আপনি যে ইতস্তত করছেন।

যশোবন্ত। কুমার মহম্মদ সৈন্যের পুরোভোগে থাকবে কথা ছিল।

ঔরংজীব। আমি মত বদলেছি। তিনি থাকবেন আপনার দক্ষিণ পাশে!

যশোবন্ত। আর মীরজুমলা?

ঔরংজীব। আপনার পশ্চাতে। আমি আপনার বামপাশে থাকব।

যশোবন্ত। ও! বুঝেছি! জাঁহাপনা আমায় সন্দেহ করেন।

ঔরংজীব। মহারাজ চতুর। মহারাজের সঙ্গে চাতুরী নিষ্ফল। মহারাজকে সঙ্গে এনেছি, তার কারণ এ নয় যে, মহারাজকে আমরা পরমাত্মীয় জ্ঞান করি। সঙ্গে এনেছি এই কারণে যে আমার অনুপস্থিতিতে মহারাজ আগ্রায় বিভ্রাট না বাধান—সেটা বেশ জানেন বোধ হয়।

যশোবন্ত। না অতদূর ভাবিনি। জাঁহাপনা! আমি চতুর বলে আমার একটা অহঙ্কার ছিল; কিন্তু দেখলাম যে সে-বিষয়ে জাঁহাপনার কাছে আমি শিশু।

ঔরংজীব। এখন মহারাজের অভিপ্রায় কী?

যশোবন্ত। জাঁহাপনা! রাজপুত জাতি বিশ্বাসঘাতকের জাতি নয়। কিন্তু আপনারা—অন্তত আপনি তাদের বিশ্বাসঘাতক করে তুলেছেন; কিন্তু সাবধান জাঁহাপনা! এই রাজপুত জাতিকে ক্ষিপ্ত করবেন না! বন্ধুত্বে রাজপুতের মতো মিত্র কেহ নেই। আবার শত্রুতায় রাজপুতের মতো ভয়ঙ্কর শত্রু কেউ নেই। সাবধান!

ঔরংজীব। মহারাজ! ঔরংজীবের সম্মুখে ভ্রূকুটি করে কোনো লাভ নাই! যান। আমার এই আজ্ঞা। পালন করবেন। নইলে জানেন ঔরংজীবকে!

যশোবন্ত। জানি। আর আপনিও জানেন যশোবন্ত সিংহকে! আমি কারো ভৃত্য নই। আমি ও-আজ্ঞা পালন করব না।

ঔরংজীব। মহারাজ! নিশ্চিত জানবেন ঔরংজীব কখনো কাউকে ক্ষমা করে না! বুঝে কাজ করবেন।

যশোবন্ত। আর আপনিও নিশ্চিত জানবেন যে, যশোবন্ত সিংহ কাউকে ভয় করে না। বুঝে কাজ করবেন!

ঔরংজীব। এও কি সম্ভব!

যশোবন্ত। ঔরংজীব!

ঔরংজীব। যদি তোমায় এই মুহূর্তে আমি বন্দি করি, তোমায় কে রক্ষা করে?

যশোবন্ত। এই তরবারি। জেনো ঔরংজীব, এই দুর্দিনেও মহারাজ যশোবন্ত সিংহের এক ইঙ্গিতে ত্রিশসহস্র রাজপুত-তরবারি একসঙ্গে সূর্যকিরণে ঝলসে উঠে! আর এ দুর্দিনেও রাজপুত—রাজপুত!
[প্রস্থান]

ঔরংজীব। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছি। একটু বেশি গিয়েছি। এই রাজপুত জাতটাকে আমি সম্যক চিনলাম না। এত তার দর্প! এত অভিমান!—চিনলাম না।

দিলদার। চিনবেন কেমন করে জাঁহাপনা! আপনার শাঠ্যের রাজ্যেই বাস। আপনি দেখে আসছেন শুধু জোচ্চোরি, খোশামুদি, নেমকহারামি। তাদের বশ করতে আপনি পটু; কিন্তু এ আলাদা রকমের রাজ্য। এ রাজ্যের প্রজাদের কাছে প্রাণের চেয়ে মান বড়।

ঔরংজীব। হুঁ—দেখি এখনও যদি প্রতিকার করতে পারি; কিন্তু বোধ হচ্ছে—রোগ এখন হাকিমির বাইরে!

[প্রস্থান]

দিলদার। দিলদার! তুমি সেঁধিয়েছিলে ছুঁচ হয়ে—এখন ফাল হয়ে না বেরোও! আমার সেই ভয়। প্রথমে পাঠক! তার পরে বিদূষক! তার পর রাজনৈতিক! তার পরে বোধ হয় দার্শনিক! তার পরে?
কথা কহিতে কহিতে ঔরংজীব ও মীরজুমলার পুনঃপ্রবেশ

ঔরংজীব। কেবল দেখবেন অনিষ্ট না করতে পারে!

মীরজুমলা। যে আজ্ঞা।

ঔরংজীব। তার চক্ষে একটা বড়বেশি রক্তবর্ণ দীপ্তি দেখেছি! আর একেবারে প্রাণের ভয় নেই। সমস্ত রাজপুত জাতটাই তাই।

মীরজুমলা। যে আজ্ঞা।

ঔরংজীব। একবার মহম্মদকে পাঠান—না, আমিই তার শিবিরে যাচ্ছি।

[প্রস্থান]

মীরজুমলা। এই যুদ্ধে ঔরংজীব যেরূপ বিচলিত হয়েছেন, এর পূর্বে আমি তাঁকে এরকম বিচলিত হতে কখনো দেখিনি!—ভায়ে ভায়ে যুদ্ধ—তাই বোধহয়!—ওহ্! ভায়ে ভায়ে বিবাদ কী অস্বাভাবিক! কী ভয়ঙ্কর!

দিলদার। আর কী উত্তেজক! এ নেশা সব নেশার চরম। উজিরসাহেব! আমি এইটে কোনোরকমেই বুঝতে পারি না যে শত্রুতা বাড়াবার জন্য মানুষ কেন এতগুলো ধর্মের সৃষ্টি করেছিল—যখন ঘরে এতবড় শত্রু। কারণ ভাইয়ের মতো শত্রু আর কেউ নয়।

মীরজুমলা। কেন?

দিলদার। এই দেখুন উজিরসাহেব, হিন্দু আর মুসলমান, এদের কি মেলে? প্রথমত ভগবানের দান যে এ চেহারাখানা, টেনেবুনে যতখানি আলাদা করা যায় তা তারা করেছে। এরা রাখে দাড়ি সম্মুখে—ওরা রাখে টিকি পিছনে

[তাও সম্মুখে রাখবে না]। এরা পশ্চিমে মুখ ফিরিয়ে নেওয়াজ পড়ে, ওরা পূর্বদিকে মুখ ফিরিয়ে প্রার্থনা করে। এরা কাছা দেয় না, ওরা দেয়। এরা লেখে ডান দিক থেকে বাঁয়ে, ওরা লেখে বাঁয়ে থেকে ডাইনে—লেখে না!

মীরজুমলা। হাঁ, তাই কী?

দিলদার। তবু হিন্দুরা মুসলমানের অধীনে একরকম সুখে আছে বলতে হবে; কিন্তু ভাই ভাইয়ের প্রভুত্ব স্বীকার করবে না।

মীরজুমলা হাসিলেন

দিলদার। [যাইতে যাইতে] কেমন ঠিক কি না?

মীরজুমলা। [যাইতে যাইতে] হাঁ ঠিক।

[নিষ্ক্রান্ত]

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—খিজুয়ায় সুজার শিবির। কাল—সন্ধ্যা।
সুজা একখানি মানচিত্র দেখিতেছিলেন।
পুষ্পমালা হস্তে পিয়ারা গাহিতে গাহিতে
প্রবেশ করিলেন

পিয়ারার গীত

আমি সারা সকালটি বসে বসে এই
সাধের মালাটি গেঁথেছি।
আমি, পরাব বলিয়ে তোমারি গলায়
মালাটি আমার গেঁথেছি।
আমি, সারা সকালটি করি নাই কিছু
করি নাই কিছু বঁধু আর;
শুধু বকুলের তলে বসিয়ে বিরলে
মালাটি আমার গেঁথেছি।
তখন গাহিতেছিল সে তরুশাখা পরে
সুললিত স্বরে পাপিয়া;
তখন দুলিতেছিল সে তরুশাখা ধীরে,
প্রভাত-সমীরে কাঁপিয়া।
তখন প্রভাতের হাসি, পড়েছিল আসি
কুসুমকুঞ্জভবনে;
আমি তারি মাঝখানে, বসিয়া বিজনে

মালাটি আমার গেঁথেছি।
বঁধু মালাটি আমার গাঁথা নহে শুধু
বকুল কুসুম কুড়ায়ে;
আছে প্রভাতের প্রীতি সমীরণ গীতি
কুসুমে কুসুমে জড়ায়ে;
আছে, সবার উপরে মাখা তায় বঁধু
তব মধুময় হাসি গো;
ধরো, গলে ফুলহার, মালাটি তোমার,
তোমারই কারণে গেঁথেছি।
পিয়ারা মালাটি সুজার গলায় দিলেন

সুজা। [হাসিয়া] এ কি আমার বরমাল্য পিয়ারা? আমি তো যুদ্ধে এখনও জয়লাভ করিনি!

পিয়ারা। কী যায় আসে? আমার কাছে তুমি চিরজয়ী। তোমার প্রেমের কারাগারে আমি বন্দিনী। তুমি আমার প্রভু, আমি তোমার ক্রীতদাস—কী আজ্ঞা হয়? [জানু পাতিলেন]

সুজা। এ একটা বেশ নূতন রকমের ঢং করেছ তো পিয়ারা! আচ্ছা, যাও বন্দিনী, আমি তোমায় মুক্ত করে দিলাম।

পিয়ারা। আমি মুক্তি চাই না। আমার এ মধুর দাসত্ব।

সুজা। শোনো! আমি একটা ভাবনায় পড়েছি!

পিয়ারা। সে ভাবনাটা হচ্ছে কী?—দেখি আমি যদি কোনো উপায় করতে পারি।

সুজা। [মানচিত্র দেখাইয়া] দেখ পিয়ারা—এইখানে মীরজুমলার কামান, এইখানে মহম্মদের পাঁচহাজার অশ্বারোহী, আর এইখানে ঔরংজীব।

পিয়ারা। কই আমি তো শুধু একখানা কাগজ দেখছি। আর তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

সুজা। এখন এইরকম ভাবে আছে; কিন্তু কাল যুদ্ধের সময় কে কোথায় থাকবে বলা যাচ্ছে না!

পিয়ারা। কিছু বলা যাচ্ছে না।

সুজা। ঔরংজীবের দস্তুর এই যে যখন তার পক্ষে কামানের গোলাবর্ষণ হয়, তার ঠিক পরেই সে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে আক্রমণ করে।

পিয়ারা। বটে। তা হলে তো বড় সহজ কথা নয়।

সুজা। তুমি কিছু বোঝ না।

পিয়ারা। ধরে ফেলেছ!—কেমন করে জানলে? হাঁ গা—বলো না কেমন করে জানলে? আশ্চর্য! একেবারে ঠিক ধরেছ!

সুজা। আমার সৈন্য অশিক্ষিত। আমি যশোবন্ত সিংহকে ভজাতে পারি—একবার লিখে দেখব। কিন্তু—আচ্ছা, তুমি কী উপদেশ দেও?

পিয়ারা। আমি তোমাকে উপদেশ দেওয়া ছেড়ে দিয়েছি।

সুজা। কেন?

পিয়ারা। কেন! তোমায় উপদেশ দিলে তো তুমি তা কখনো শোনো না। আমি তোমায় বেশ জানি। তুমি বিষম একগুঁয়ে। আমাকে আমার মত জিজ্ঞাসা করো বটে, কিন্তু তোমার বিপরীত মত দিলেই চটে যাও।

সুজা। তা—হাঁ—তা—যাই বটে।

পিয়ারা। তাই সেই থেকে, স্বামী যা বলেন তাতেই আমি পতিব্রতা হিন্দু স্ত্রীর মতো হুঁ হাঁ দিয়ে সেরে দিই।

সুজা। তাই তো। দোষ আমারই বটে। পরামর্শ চাই বটে, কিন্তু অনুকূল পরামর্শ না দিলেই চটে যাই।—ঠিক বলেছ! কিন্তু শোধরাবারও উপায় নাই।

পিয়ারা। না। তোমার উদ্ধারের উপায় থাকলে আমি তোমায় উদ্ধার করতাম। তাই আমি আর সে চেষ্টা করিনে। আপন মনে গান গাই।

সুজা। তাই গাও। তোমার গান যেন সুরা। শত দুঃখে শত যন্ত্রণা ভুলিয়ে দেয়। কঠিন ঘটনার রাজ্য থেকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। তখন আমার বোধ হয় যেন একটা ঝঙ্কার আমায় ঘিরে রয়েছে। আকাশ, মর্ত—আর কিছুই দেখতে পাই না। গাও—কাল যুদ্ধ। সে অনেক দেরি! যা হবার তাই হবে। গেয়ে যাও।

পিয়ারা। তবে তা শুনবার আগেই এই পূর্ণ-জোছনালোকে তোমার মনকে স্নান করিয়ে নাও। তোমার বাসনাপুষ্পগুলিকে প্রেমচন্দন মাখিয়ে নাও—তার পরে আমি গান গাই—আর তুমি তোমার সেই পুষ্পগুলি আমার চরণে দান করো!

সুজা। হাঃ! হাঃ! হাঃ! তুমি বেশ বলেছ—যদিও আমি তোমার উপমার ঠিক রসগ্রহণ করতে পারলাম না।

পিয়ারা। চুপ! আমি গান গাই, তুমি শোনো। প্রথমত এই জায়গাটায় হেলান দিয়ে—এইরকম করে বোসো! তার পরে হাতটা এই জায়গায় এইরকমভাবে রাখো! তারপরে চোখ বোজো—যেমন খৃস্টানেরা প্রার্থনা করবার সময় চোখ বোজে—মুখে যদিও বলে অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে যাও—কিন্তু কার্যত যেটুকু ঈশ্বরের আলো পাচ্ছিল, চোখ বুজে তাও অন্ধকার করে ফেলে।

সুজা। হা! হা! হা! তুমি অনেক কথা বলো বটে, কিন্তু যখন এই বক-ধার্মিকদের ঠাট্টা করো, তখন যেমন মিষ্টি লাগে—কারণ আমি কোনো ধর্মই মানিনে।

পিয়ারা। ব্যাকরণ ভুল। যেমন বললেই একটা তেমন বলা চাই—

সুজা। দারা হিন্দুধর্মের পক্ষপাতী—ভণ্ড। ঔরংজীব গোঁড়া মুসলমান—ভণ্ড। মোরাদও মুসলমান—গোঁড়া নয়—ভণ্ড।

পিয়ারা। আর তুমি কোনো ধর্মই মানো না—ভণ্ড।

সুজা। কিসে?—আমি কোনো ধর্মেরই ভান করিনে। আমি সোজাসুজি বলি যে, আমি সম্রাট হতে চাই।

পিয়ারা। এইটেই ভণ্ডামি।

সুজা। ভণ্ডামি কিসে! আমি দারার প্রভুত্ব স্বীকার করতে রাজি ছিলাম; কিন্তু আমি ঔরংজীব আর মোরাদের প্রভুত্ব মানতে পারিনে। আমি তাদের বড়ভাই।

পিয়ারা। ভণ্ডামি—বড়ভাই হওয়া ভণ্ডামি।

সুজা। কিসে? আমি আগে জন্মেছিলাম?

পিয়ারা। আগে জন্মানো ভণ্ডামি। আর আগে জন্মানোতে তোমার নিজের কোনো বাহাদুরি নেই। তার দরুন তুমি সিংহাসন বেশি দাবি করতে পারো না।

সুজা। কেন?

পিয়ারা। আমাদের বাবুর্চি ঐ রহমৎউল্লা তোমার অনেক আগে জন্মেছে। তবে তোমার চেয়ে সিংহাসনের উপর তার দাবি বেশি!

সুজা। সে তো আর সম্রাটের পুত্র নয়।

পিয়ারা। হতে কতক্ষণ!

সুজা। হাঃ! হাঃ! হাঃ! তুমি ঐরকম তর্ক করবে? না তুমি গান গাও—যা পারো!

পিয়ারার গীত

তুমি বাঁধিয়া কী দিয়ে রেখেছ হৃদি এ,
(আমি) পারি না যেতে ছাড়ায়ে,
এ যে বিচিত্র নিগূঢ় মধুর—
(কী) প্রিয় বাঞ্ছিত কারা এ।
এ যে যেতে বাজে চরণে। এ যে বিরহ বাজে স্মরণে
কোথা যায় মিলিয়া সে মিলনের হাসে
চুম্বনের পাশে হারায়ে।

সুজা। পিয়ারা! ঈশ্বর তোমাকে তৈরি করেছিলেন কেন? ঐ রূপ, ঐ রসিকতা, ঐ সঙ্গীত! এমন একটা ব্যাপার ঈশ্বর এই কঠিন মর্ত্যভূমে তৈরি করেছিলেন কেন?

পিয়ারা। তোমারি জন্য প্রিয়তম।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—আমেদাবাদ। দারার শিবির। কাল—রাত্রি।

দারা। আশ্চর্য! যে দারা একদিন সেনাপতি নরপতির উপরে হুকুম চালাত, সে নগর হতে নগরে প্রতাড়িত হয়ে আজ পরের দুয়ারে ভিখারি; আর তার দুয়ারে ভিখারি, যে ঔরংজীবের আর মোরাদের শ্বশুর। এত নীচে নেমে যেতে হবে তা ভাবিনি।

নাদিরা। পুত্র সোলেমানের খবর পেয়েছ কিছু?

দারা। তার খবর সেই এক। মহারাজ জয়সিংহ তাকে পরিত্যাগ করে সসৈন্যে ঔরংজীবের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। বেচারি পুত্র জনকতক অবশিষ্ট সঙ্গীমাত্র নিয়ে [তাকে আর সৈন্য বলা যায় না] হরিদ্বারের পথে লাহোরে আমার উদ্দেশে আসছিল! পথে ঔরংজীবের এক সৈন্যদল তাকে শ্রীনগরের প্রান্তে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। সোলেমান এখন শ্রীনগরের রাজা পৃথ্বীসিংহের দ্বারে ভিখারি। কি নাদিরা—কাঁদছ?

নাদিরা। না প্রভু।

দারা। না কাঁদো। কিছু সান্ত্বনা পাবে।—যদি কাঁদতেও পারতাম!

নাদিরা। আবার ঔরংজীবের সঙ্গে যুদ্ধ করব?

দারা। করব। যতদিন এ দেহে প্রাণ আছে, ঔরংজীবের প্রভুত্ব স্বীকার করব না। যুদ্ধ করব। সে আমার বৃদ্ধ পিতাকে কারারুদ্ধ করে তাঁর সিংহাসন অধিকার করেছে; আমি যতদিন না পিতাকে কারামুক্ত করতে পারি, যুদ্ধ করব। কি নাদিরা! মাথা হেঁট করলে যে! আমার এ সঙ্কল্প তোমার পছন্দ হচ্ছে না! —কী করব!

নাদিরা। না নাথ! তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা, তবে—

দারা। তবে?

নাদিরা। নাথ! নিত্য এই আতঙ্ক, এই প্রয়াস, এই পলায়ন কেন?

দারা। কী করবে বলো, যখন আমার হাতে পড়েছ তখন সইতে হবে বৈকি?

নাদিরা। আমি আমার জন্য বলছি না প্রভু! আমি তোমারই জন্য বলছি। একবার আয়নায় নিজের চেহারাখানি দেখ নাথ—এই অস্থিসার দেহ, এই নিষ্প্রভ দৃষ্টি, এই শুভ্রায়িত কেশ—

দারা। আজ যদি আমার এ চেহারা তোমার পছন্দ না হয়—কী করব!

নাদিরা। আমি কি তাই বলছি!

দারা। তোমাদের জাতির স্বভাব। তোমাদের কী! তোমরা কেবল অনুযোগ করতে পারো। তোমরা আমাদের সুখে বিঘ্ন, দুঃখে বোঝা!

নাদিরা। [ভগ্নস্বরে] নাথ! সত্যই কি তাই! [হস্তধারণ]

দারা। যাও! এ সময়ে আর নাকিসুর ভালো লাগে না।

[হাত ছাড়াইয়া প্রস্থান]

নাদিরা। [কিছুক্ষণ চক্ষে বস্ত্র দিয়া রহিলেন। পরে গাঢ়স্বরে কহিলেন] দয়াময় আর কেন।—এইখানে যবনিকা ফেলে দাও! সাম্রাজ্য হারিয়েছি, প্রাসাদ সম্ভোগ ছেড়ে এসেছি, পথে—রৌদ্রে, শীতে, অনশনে, অনিদ্রায় কতদিন কাটিয়েছি; সব হেসে সহ্য করেছি, কারণ স্বামীর সোহাগ হারাই নাই।—কিন্তু আজ—[কণ্ঠরুদ্ধ হইল] তবে আর কেন! আর কেন! সব সইতে পারি, শুধু এইটে সইতে পারিনে। [ক্রন্দন]

সিপারের প্রবেশ

সিপার। মা—এ কী? তুমি কাঁদছ মা!

নাদিরা। না বাবা আমি কাঁদছি না—ওহ্, সিপার! সিপার! [ক্রন্দন]

সিপার কাছে আসিয়া নাদিরার গলদেশে হাত দিয়া চক্ষের বস্ত্র সরাইতে গেল

সিপার। মা কাঁদছ কেন? কে তোমার হৃদয়ে আঘাত দিয়েছে? আমি তাকে কখনও ক্ষমা করব না—আমি—তাকে—

এই বলিয়া সিপার নাদিরার গলদেশ জড়াইয়া তাঁহার বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

নাদিরা তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন

জহরৎ উন্নিসার প্রবেশ

জহরৎ। এ কী!—মা, কাঁদছে কেন সিপার?

নাদিরা। না জহরৎ! আমি কাঁদছি না।

জহরৎ। মা! তোমার চক্ষে জল তো কখনো দেখি নাই। জোছনার মতো—রাত্রি যত গভীর, তোমার হাসিটি তত উজ্জ্বল দেখেছি! অনশনে অনিদ্রায় চেয়ে দেখছি যে তোমার অধরে সে-হাসিটি দুর্দিনের বন্ধুর মতো লেগেই আছে—আজ এ কী মা?

নাদিরা। যন্ত্রণা বাক্যের অতীত জহরৎ। আজ আমার দেবতা বিমুখ হয়েছেন!

দারার পুনঃপ্রবেশ

দারা। নাদিরা! আমায় ক্ষমা করো! আমার অপরাধ হয়েছে। বাহিরে গিয়েই বুঝতে পেরেছি।

নাদিরা প্রবলতর বেগে কাঁদিতে লাগিলেন

দারা। নাদিরা! আমি অপরাধ স্বীকার করছি! ক্ষমা চাচ্ছি। তবু—ছিঃ! নাদিরা যদি জানতে, যদি বুঝতে যে এ অন্তরে কী জ্বালা দিবারাত্র জ্বলছে—তা হলে আমার এই অপরাধ নিতে না।

নাদিরা। আর তুমি যদি জানতে প্রিয়তম : যে, আমি তোমায় কত ভালোবাসি, তা হলে এত কঠিন হতে পারতে না!

সিপার। [অস্ফুটস্বরে] তোমায় যে আমি দেবতার মতো ভক্তি করি বাবা!

নাদিরা। বৎস! তোমার বাবা আমায় কিছু বলেননি! আমি বড়বেশি অভিমানিনী—আমারই দোষ।

বাঁদীর প্রবেশ

বাঁদী। বাহিরে একজন লোক ডাকছেন, খোদাবন্দ।

দারা। কে তিনি?

বাঁদী। শুনলাম তিনি গুজরাটের সুবাদার।

দারা। সুবাদার এসেছেন?

নাদিরা। আমি ভিতরে যাই। [প্রস্থান]

দারা। তাঁকে এইখানেই নিয়ে এসো সিপার।

[বাঁদীর সহিত সিপারের প্রস্থান।

দেখা যাকি—যদি আশ্রয় পাই।

সাহা নাবাজ ও সিপারের প্রবেশ

সাহা নাবাজ। বন্দেগি যুবরাজ!

দারা। বন্দেগি সুলতানসাহেব!

সাহা নাবাজ। জাঁহাপনা আমায় স্মরণ করেছেন?

দারা। হাঁ সুলতানসাহেব! আমি একবার আপনার সাক্ষাৎ চেয়েছিলাম।

সাহা নাবাজ। আজ্ঞা করুন!

দারা। আজ্ঞা করব! সে দিন গিয়েছে সুলতানসাহেব; আজ ভিক্ষা করতে এসেছি। আজ্ঞা করবে এখন—ঔরংজীব।

সাহা নাবাজ। ঔরংজীব! তার আজ্ঞা আমার জন্য নয়।

দারা। কেন সুলতানসাহেব! আজ ঔরংজীব ভারতের সম্রাট।

সাহা নাবাজ। ভারতের সম্রাট ঔরংজীব? যে স্বার্থত্যাগের মুখোশ পরে বৃদ্ধ পিতার বিপক্ষে যুদ্ধ করে, স্নেহের মুখোশ পরে ভাইকে বন্দি করে, ধর্মের মুখোশ পরে সিংহাসন অধিকার করে—সে সম্রাট? আমি বরং এক অন্ধ পঙ্গুকে সেই সিংহাসনে বসিয়ে তাকে সম্রাট বলে অভিবাদন করতে রাজি আছি; কিন্তু ঔরংজীবকে নয়।

দারা। সে কী সুলতানসাহেব! ঔরংজীব আপনার জামাতা।

সাহা নাবাজ। ঔরংজীব যদি আমার জামাতা না হয়ে আমার পুত্র হত, আর সেই পুত্র আমার একমাত্র সন্তান হত তো আমি তার সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করতাম! অধর্মকে কখনো বরণ করতে পারি না—আমার জীবন থাকতে না।

দারা। কী করবেন স্থির করেছেন?

সাহা নাবাজ। যুবরাজ দারার পক্ষে যুদ্ধ করব। পূর্ব থেকেই তার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। আমার এই সামান্য সৈন্য দিয়ে ঔরংজীবের সঙ্গে যুদ্ধ করা অসম্ভব। তাই আমি সৈন্য সংগ্রহ করছি।

দারা। কী রকমে?

সাহা নাবাজ। মহারাজ যশোবন্ত সিংহের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করে পাঠিয়েছি।

দারা। তিনি সাহায্য করতে স্বীকৃত হয়েছেন?

সাহা নাবাজ। হয়েছেন।—কোনো ভয় নাই শাহাজাদা। আসুন—আপনি আজ আমার অতিথি—সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্র। আপনি তাঁর মনোনীত সম্রাট। আমি একজন বৃদ্ধ রাজভক্ত প্রজা। বৃদ্ধ সম্রাটের জন্য যুদ্ধ করব। জয়লাভ না করতে পারি, প্রাণ দিতে পারব! বৃদ্ধ হয়েছি, একটা পুণ্য করে পাথেয় কিছু সংগ্রহ করে নিয়ে যাই।

দারা। তবে আপনি আমায় আশ্রয় দিচ্ছেন?

সাহা নাবাজ। আশ্রয় যুবরাজ! আজ থেকে আমার বাড়ি আপনার বাড়ি। আমি যুবরাজের ভৃত্য।

দারা। আপনি অতি মহৎ ব্যক্তি।

সাহা নাবাজ। শাহাজাদা! আমি মহৎ নই—আমি একজন মানুষ। আর আমি যা করছি একটা মহা স্বার্থত্যাগ করছি যে তা মানি না। শাহাজাদা! আজ আমি এত বৃদ্ধ হয়েছি—তবু সাহস করে বলতে পারি যে, জেনে অধর্ম করিনি; কিন্তু ভালো কাজও বড় একটা করিনি। আজ যদি সুযোগ পেয়েছি—ছাড়ব কেন?

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত]

জহরৎ উন্নিসার পুনঃপ্রবেশ

জহরৎ। এত তুচ্ছ অসার অকর্মণ্য আমি। পিতার কোনো কাজেই লাগি না। শুদ্ধ একটা বোঝা!—হা রে অধম নারীজাতি! পিতামাতার এই অবস্থা দেখছি কিছু করতে পারছি না। মাঝে মাঝে কেবল উষ্ণ অশ্রুপাত।—কিন্তু আমি যাহোক একটা কিছু করব, একটা কিছু—যা পর্বতশিখর হতে ঝম্পের মতো অসমসাহসিক—তার মতো ভয়ঙ্কর।—দেখি।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—কাশ্মিরের মহারাজা পৃথ্বীসিংহের
প্রমোদোদ্যান। কাল—সন্ধ্যা।

সোলেমান একাকী

সোলেমান। এলাহাবাদ থেকে পালিয়ে শেষে এই দূর পার্বত্য কাশ্মিরে আসতে হল! পিতার সাহায্যে বেরিয়েছিলাম। নিষ্ফল হয়েছি।—সুন্দর এই দেশ। যেন একটা কুসুমিত সঙ্গীত, একটা চিত্রিত স্বপ্ন, একটা অলস সৌন্দর্য। স্বর্গের একটি অপ্সরা যেন মর্ত্যে নেমে এসে, ভ্রমণে শ্রান্ত হয়ে, পা ছড়িয়ে হিমালয়ের গায়ে হেলে, বাম করতলে কপোল রেখে, নীল আকাশের দিকে চেয়ে আছে। এ কী সঙ্গীত!

দূরে সঙ্গীত

এ যে ক্রমেই কাছে আসছে। ঐ যে একখানি সজ্জিত নৌকায় কয়টি সজ্জিতা নারী নিজেরাই নৌকা বেয়ে গাইতে গাইতে আসছে।—কী সুন্দর! কী মধুর!

একখানি সজ্জিত তরণীর উপর সজ্জিতা
রমণীদিগের প্রবেশ ও গীত

বেলা বয়ে যায়—
ছোট্ট মোদের পানসীতরী সঙ্গেতে কে যাবি আয়।
দোলে হার—বকুল যুঁথি দিয়ে গাঁথা সে,
রেশমি পাল উড়ছে মধুর মধুর বাতাসে;
হেলছে তরী দুলছে তরী—ভেসে যাচ্ছে দরিয়ায়।
যাত্রী সব নূতন প্রেমিক, নূতন প্রেমে ভোর;

মুখে সব হাসির রেখা, চোখে ঘুমের ঘোর
বাঁশির ধ্বনি,
হাসির ধ্বনি উঠছে ছুটে ফোয়ারায়।
পশ্চিমে জ্বলছে আকাশ সাঁঝের তপনে;
পূর্বে ঐ বুনছে চন্দ্র মধুর স্বপনে;
করছে নদী কুলুধ্বনি, বইছে মৃদু মধুর বায়।

১ নারী। সুন্দর যুবা! কে আপনি?

সোলেমান। আমি দারা সেকোর পুত্র সোলেমান।

১ নারী। সম্রাট সাজাহানের পুত্র দারা সেকো! তাঁর পুত্র আপনি!

সোলেমান। হাঁ আমি তার পুত্র।

১ নারী। আর আমি কে, তা যে জিজ্ঞাসা করছ না সোলেমান? আমি কাশ্মিরের প্রধানা নর্তকী—রাজার প্রেয়সী গণিকা। এরা আমার সহচরী!—এসো আমাদের সঙ্গে নৌকায়।

সোলেমান। তোমার সঙ্গে? হায় হতভাগিনী নারী। কী জন্য?

১ নারী। সোলেমান! তুমি এত শিশু নও কিছু! তুমি আমাদের ব্যবসাবৃত্তি তো জানো।

সোলেমান। জানি। জানি বলেই তো আমার এত অনুকম্পা। এ রূপ এ যৌবন কি ব্যবসার সামগ্রী? রূপ—শরীর, ভালোবাসা তার প্রাণ। প্রাণহীন শরীর নিয়ে কী করব নারী?

১ নারী। কেন! আমরা কি ভালোবাসতে জানি না?

সোলেমান। শিখবে কোথা থেকে বলো দেখি! যারা রূপকে পণ্য করেছে, যারা হাসিটি পর্যন্ত বিক্রয় করে—তারা ভালোবাসবে কেমন করে? ভালোবাসা-যে কেবল দিতে চায়—সে যে ত্যাগীর সুখ—সে সুখ তোমরা কী করে বুঝবে মা!

১ নারী। তবে আমরা কি কখনো ভালোবাসি না?

সোলেমান। বাসো—তোমরা ভালোবাসো কিংখাবের পাগড়ি, হীরার আংটি, কার্পেটের জুতো, হাতির দাঁতের ছড়ি। তোমরা হদ্দমন্দ ভালোবাসতে পারো—কোঁকড়া চুল, পটলচেরা চোখ, সরল নাসা, সরস অধর। আমার এই গৌরবর্ণ চেহারাখানি দেখেছ, কিংবা আমি সম্রাটের পৌত্র শুনেছ, বুঝি মুগ্ধ হয়েছ। এ তো ভালোবাসা নয়। ভালোবাসা হয় আত্মায় আত্মায়।—যাও মা।

২ নারী। ঐ রাজা আসছেন।

১ নারী। আজ এ হেন অসময়ে?—চলো।—যুবক! এর প্রতিফল পাবে।

সোলেমান। কেন ক্রুদ্ধ হও মা? তোমাদের প্রতি আমার কোনো ঘৃণা-বিদ্বেষ নেই! কেবল একটা অনুকম্পা—অসীম—অতলস্পর্শ।

[গাইতে গাইতে নারীগণের প্রস্থান]

সোলেমান।	কী আশ্চর্য—ঐ অপার্থিব রূপ, নয়নের ঐ জ্যোতি, অপ্সরাসম্ভব গঠন, ঐ কিন্নর কণ্ঠ—এত সুন্দর—কিন্তু এত কুৎসিত।

পরিক্রমণ

শ্রীনগরের রাজা পৃথ্বীসিংহের প্রবেশ

রাজা।	ছিঃ কুমার!
সোলেমান।	কী মহারাজ?
রাজা।	আমি তোমাকে নিরাশ্রয় দেখে আশ্রয় দিয়েছিলাম, আর যথাসম্ভব সুখেও রেখেছিলাম। তোমার জন্য ঔরংজীবের সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি।
সোলেমান।	আমি তো কখনও অস্বীকার করি নাই মহারাজ!
রাজা।	এখনও শায়েস্তা খাঁ তোমাকে ধরিয়ে দেবার জন্যে সম্রাটের পক্ষ হয়ে অনেক অনুনয় করছিলেন, প্রলোভন দেখাচ্ছিলেন। আমি তবু স্বীকার হইনি।
সোলেমান।	আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।
রাজা।	কিন্তু তুমি এত অনুদার, লঘুচিত্ত, উচ্ছৃঙ্খল তা জানতাম না।
সোলেমান।	সে কী মহারাজ!
রাজা।	আমি তোমাকে আমার বহিরুদ্যান বেড়াবার জন্য ছেড়ে দিয়েছি; কিন্তু তুমি যে তা ছেড়ে আমার প্রমোদ-উদ্যানে প্রবেশ করে আমার রক্ষিতাদের সঙ্গে হাস্যালাপ করবে, তা কখনো ভাবি নাই।
সোলেমান।	মহারাজ আপনি ভুল বুঝেছেন—
রাজা।	তুমি সুন্দর, যুবা রাজপুত্র; কিন্তু তাই বলে—
সোলেমান।	মহারাজ! মহারাজ—আমি—
রাজা।	যাও, যুবরাজ। কোনো দোষস্খালনের চেষ্টা নিষ্ফল।

[উভয়ে বিপরীত দিকে নিষ্ক্রান্ত]

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—এলাহাবাদে ঔরংজীবের শিবির।
কাল—রাত্রি।

ঔরংজীব একাকী

ঔরংজীব।	কী অসমসাহসিক এই মহারাজ যশোবন্ত সিংহ! খিজুয়া যুদ্ধক্ষেত্রে শেষ রাত্রে আমার মহিলাশিবির পর্যন্ত লুণ্ঠন করে একটা জলোচ্ছ্বাসের মতো আমার সৈন্যের উপর দিয়ে চলে গেল!—অদ্ভুত! যা হোক, সুজার সঙ্গে এ যুদ্ধে জয়ী হয়েছি!—কিন্তু ওদিকে আবার মেঘ করে আসছে। আর একটা ঝড় উঠবে। সাহা নাবাজ আর দারা—সঙ্গে যশোবন্ত সিংহ।

ভয়ের কারণ আছে। যদি—না তা করব না। এই জয়সিংহকে দিয়েই করতে হবে।—এই যে মহারাজ।

মহারাজ জয়সিংহের প্রবেশ

জয়সিংহ। জাঁহাপনা আমাকে স্মরণ করেছিলেন?

ঔরংজীব। হাঁ, আমি এতক্ষণ ধরে আপনার প্রতীক্ষা করছিলাম। আসুন—উহ্ বিষম গরম পড়েছে।

জয়সিংহ। বিষম গরম! কী রকম একটা ভাপ উঠছে যেন।

ঔরংজীব। আমার সর্বাঙ্গে আগুনের ফুলকি উড়ে যাচ্ছে। আপনার শরীর ভালো আছে?

জয়সিংহ। জাঁহাপনার মেহেরবানে—বান্দা ভালো আছে।

ঔরংজীব। দেখুন মহারাজ! আমি কাল প্রত্যূষে দিল্লি ফিরে যাচ্ছি, আপনিও আমার সঙ্গে ফিরে যাচ্ছেন কি?

জয়সিংহ। যেরূপ আজ্ঞা হয়—

ঔরংজীব। আমার ইচ্ছা যে আপনি আমার সঙ্গে যান।

জয়সিংহ। যে আজ্ঞে, আমি অষ্টপ্রহরই প্রস্তুত। জাঁহাপনার আজ্ঞা পালন করাই আনন্দ।

ঔরংজীব। তা জানি মহারাজ! আপনার মতো বন্ধু সংসারে বিরল। আর আপনি আমার দক্ষিণ হস্ত।

জয়সিংহ সেলাম করিলেন

ঔরংজীব। মহারাজ! অতি দুঃখের বিষয় যে, মহারাজ যশোবন্ত সিংহ আমার ভাণ্ডার শিবির লুট করেই ক্ষান্ত নহেন। তিনি বিদ্রোহী সাহা নাবাজ আর দারার সঙ্গে যোগ দিয়েছেন।

জয়সিংহ। তার বিমূঢ়তা।

ঔরংজীব। আমি নিজের জন্য দুঃখিত নহি। মহারাজই নিজের সর্বনাশকে নিজের ঘরে টেনে আনছেন।

জয়সিংহ। অতি দুঃখের বিষয়।

ঔরংজীব। বিশেষ, আপনি তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। আপনার খাতিরে তাঁর অনেক উদ্ধত ব্যবহার মার্জনা করেছি। এমনকি তাঁর শিবিরলুণ্ঠন ব্যাপারও মার্জনা করতে প্রস্তুত আছি—শুদ্ধ আপনার খাতিরে—যদি তিনি এখনও নিরস্ত হন।

জয়সিংহ। আমি কি একবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলব?

ঔরংজীব। বললে ভালো হয়। আমি আপনার জন্য চিন্তিত। তিনি আপনার বন্ধু বলে আমি তাঁকে আমার বন্ধু করতে চাই! তাঁকে শাস্তি দিতে আমার বড় কষ্ট হবে।

জয়সিংহ। আচ্ছা, আমি একবার বুঝিয়ে বলছি।

ঔরংজীব। হাঁ বলবেন। আর এ-কথাও জানাবেন যে, তিনি এ-যুদ্ধে যদি কোনো পক্ষই না নেন তা আপনার খাতিরে তাঁর সব অপরাধ মার্জনা

করব, আর তাঁকে গুর্জর সুবা দান কনতে প্রস্তুত আছি—শুদ্ধ আপনার খাতিরে জানবেন।

জয়সিংহ। জাঁহাপনা উদার!—আমি তাঁকে নিশ্চিত রাজি করতে পারব।

ঔরংজীব। দেখুন—তিনি আপনার বন্ধু! আপনার উচিত তাঁকে রক্ষা করা!

জয়সিংহ। নিশ্চয়ই।

ঔরংজীব। তবে আপনি এখন আসুন মহারাজ! দিল্লি যাত্রা করবার জন্য প্রস্তুত হোন!

জয়সিংহ। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান]

ঔরংজীব। 'শুদ্ধ আপনার খাতিরে' অভিনয় মন্দ করি নাই! এই রাজপুত জাতি বড় সরল, আর ঔদার্যের বশ! আমি সে-বিদ্যাটাও অভ্যাস করছি। বড় ভয়ঙ্কর এ যোগ। সাহা নাবাজ আর যশোবন্ত সিংহ।—আমি কিন্তু প্রধান আশঙ্কা করছি এই মহম্মদকে। তার চেহারা—[ঘাড় নাড়িলেন] কম কথা নয়। আমার প্রতি একটা অবিশ্বাসের বীজ তার মনে কে বপন দিয়েছে। জাহানারা কি?—এই যে মহম্মদ।

মহম্মদের প্রবেশ

মহম্মদ। পিতা আমায় ডেকেছিলেন?

ঔরংজীব। হাঁ, আমি কাল রাজধানীতে ফিরে যাচ্ছি, তুমি সুজার অনুসরণ করবে। মীরজুমলাকে তোমার সাহায্যে রেখে গেলাম।

মহম্মদ। যে আজ্ঞে পিতা!

ঔরংজীব। আচ্ছা যাও। দাঁড়িয়ে রইলে যে? সে-বিষয়ে কিছু বলবার আছে?

মহম্মদ। না পিতা। আপনার আজ্ঞাই যথেষ্ট।

ঔরংজীব। তবে?

মহম্মদ। আমার একটা আরজি আছে পিতা!

ঔরংজীব। কী!—চুপ করে রইলে যে। বলো পুত্র!

মুহম্মদ। কথাটা অনেক দিন থেকে জিজ্ঞাসা করব মনে করছি; কিন্তু এ সংশয় আর বক্ষে চেপে রাখতে পারি না। ঔদ্ধত্য মার্জনা করবেন।

ঔরংজীব। বলো।

মহম্মদ। পিতা সম্রাট সাজাহান কি বন্দি?

ঔরংজীব। না! কে বলেছে?

মহম্মদ। তবে তাঁকে প্রাসাদে রুদ্ধ করে রাখা হয়েছে কেন?

ঔরংজীব। সেরূপ প্রয়োজন হয়েছে।

মহম্মদ। আর ছোটকাকা—তাঁকে এরূপ বন্দি করে রাখা কি প্রয়োজন?

ঔরংজীব। হাঁ।

মহম্মদ। আর আপনার এই সিংহাসনে বসা—পিতামহ বর্তমানে?

ঔরংজীব। হাঁ পুত্র।

মহম্মদ। পিতা! [বলিয়াই মুখ নত করিলেন]

ঔরংজীব। পুত্র! রাজনীতি বড় কূট। এ বয়সে তা বুঝতে পারবে না। সে চেষ্টা কোরো না।

মহম্মদ। পিতা! ছলে সরল ভ্রাতাকে বন্দি করা, স্নেহময় পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করা, আর ধর্মের নামে এসে সেই সিংহাসনে বসা—এর নাম যদি রাজনীতি হয়, তাহলে সে রাজনীতি আমার জন্য নয়।

ঔরংজীব। মহম্মদ! তোমার কি কিছু অসুখ করেছে? নিশ্চয়!

মহম্মদ। [কম্পিতস্বরে] না পিতা। আপাতত আমার চেয়ে সুস্থকায় ব্যক্তি বোধহয় ভারতবর্ষে আর কেহই নাই।

ঔরংজীব। তবে?

মহম্মদ নীরব রহিলেন

আমার প্রতি তোমার অটল বিশ্বাস কে বিচলিত করেছে পুত্র?

মহম্মদ। আপনি স্বয়ং।—পিতা! যতদিন সম্ভব আপনাকে আমি বিশ্বাস করে এসেছি; কিন্তু আর সম্ভব নয়। অবিশ্বাসের বিষে জর্জরিত হয়েছি।

ঔরংজীব। এই তোমার পিতৃভক্তি!—তা হবে। প্রদীপের নিচেই সর্বাপেক্ষা অন্ধকার!

মহম্মদ। পিতৃভক্তি!—পিতা! পিতৃভক্তি কি আজ আমায় আপনার কাছে শিখতে হবে! পিতৃভক্তি!—আপনি আপনার বৃদ্ধ পিতাকে বন্দি করে তাঁর যে-সিংহাসন কেড়ে নিয়েছেন আমি পিতৃভক্তির খাতিরে সেই সিংহাসন পায় ঠেলে দিয়েছি। পিতৃভক্তি! আমি যদি পিতৃভক্ত না হতাম, তো দিল্লির সিংহাসনে আজ ঔরংজীব বসতেন না, বসত এই মহম্মদ!

ঔরংজীব। তা জানি পুত্র! তাই আশ্চর্য হচ্ছি।—পিতৃভক্তি হারিও না বৎস।

মহম্মদ। না, আর সম্ভব নয় পিতা! পিতৃভক্তি বড় মহৎ, বড় পবিত্র জিনিস; কিন্তু পিতৃভক্তির উপরেও এমন একটা কিছু আছে, যার কাছে পিতা মাতা ভ্রাতা, সব খর্ব হয়ে যায়।

ঔরংজীব। তোমার পিতৃভক্তি হারিও না বলছি পুত্র! জেনো ভবিষ্যতে এই রাজ্য তোমার!

মহম্মদ। আমায় রাজ্যের লোভ দেখাচ্ছেন পিতা? বলি নাই যে, কর্তব্যের জন্য ভারত সাম্রাজ্যটা আমি লোষ্ট্রখণ্ডের মতো দূরে নিক্ষেপ করেছি? পিতামহ সেদিন এই রাজ্যের লোভ দেখাচ্ছিলেন, আপনি আজ আবার এই রাজ্যের লোভ দেখাচ্ছেন? হায়! পৃথিবীতে সাম্রাজ্য কি এতই মহার্ঘ? আর বিবেক কি এতই সুলভ? সাম্রাজ্যের জন্য বিবেক খোয়াব? পিতা! আপনি বিবেক বর্জন করে সাম্রাজ্য লাভ করেছেন, সে-সাম্রাজ্য কি পরকালে নিয়ে যেতে পারবেন? কিন্তু এই বিবেকটুকু বর্জন না করলে সঙ্গে যেত।

ঔরংজীব। মহম্মদ!

মহম্মদ। পিতা!

ঔরংজীব। এর অর্থ কী?

মহম্মদ। এর অর্থ এই যে, আমি-যে আপনার জন্য সব হারিয়ে বসে আছি, সেই আপনাকেও আজ আর হৃদয়ের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছি না—বুঝি তাও হারালাম।

	আজ আমার মতো দরিদ্র কে! আর আপনি—আপনি এই ভারতসাম্রাজ্য পেয়েছেন বটে! কিন্তু তার চেয়ে বড় সাম্রাজ্য আজ হারালেন।
ঔরংজীব।	সে সাম্রাজ্য কী?
মহম্মদ।	আমার পিতৃভক্তি! সে যে কী রত্ন! সে যে কী সম্পদ—কী যে হারালেন—আজ আর বুঝতে পারছেন না। একদিন পারবেন বোধহয়।

[প্রস্থান]

ঔরংজীব ধীরে ধীরে অপর দিকে প্রস্থান করিলেন

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—যোধপুরের প্রাসাদকক্ষ। কাল—মধ্যাহ্ন

যশোবন্ত সিংহ ও জয়সিংহ

জয়সিংহ।	কিন্তু এই রক্তপাতে লাভ?
যশোবন্ত।	লাভ? লাভ কিছু নাই।
জয়সিংহ।	তবে কেন বৃথা রক্তপাত! যখন ঔরংজীবের এ যুদ্ধ জয় হবেই!
যশোবন্ত।	কে জানে!
জয়সিংহ।	ঔরংজীবকে কখনো কোনো যুদ্ধে পরাজিত হতে দেখেছেন কি?
যশোবন্ত।	না ঔরংজীব বীর বটে! সেদিন আমি তাকে নর্মদা যুদ্ধক্ষেত্রে অশ্বারূঢ় দেখেছিলাম মনে আছে—সে-দৃশ্য আমি জীবনে কখন ভুলব না—মৌন, তীক্ষ্ণদৃষ্টি, ভ্রুকুটিকুটিল—তার চারিদিক দিয়ে তার গোলাগুলি ছুটে যাচ্ছে, তার দিকে দৃকপাত নাই। আমি তখন বিদ্বেষে ফেটে মরে যাচ্ছি কিন্তু অন্তরে তাকে সাধুবাদ না দিয়ে থাকতে পারলাম না।—ঔরংজীব বীর বটে!
জয়সিংহ।	তবে?
যশোবন্ত।	তবে আমি খিজুয়ার অপমানের প্রতিশোধ চাই।
জয়সিংহ।	সে প্রতিশোধ তো আপনি তাঁর শিবির লুট করে নিয়েছেন।
যশোবন্ত।	না সম্পূর্ণ হয়নি! কারণ, ঔরংজীবের সেই শূন্য ভাণ্ডার পূর্ণ করতে কতক্ষণ! যদি লুট করে চলে না এসে সুজার সঙ্গে যোগ দিতাম তাহলে খিজুয়া-যুদ্ধে সুজার পরাজয় হত না। কিংবা যদি আগ্রায় এসে সম্রাট সাজাহানকে মুক্ত করে দিতাম!—কী ভ্রমই হয়ে গিয়েছিল।
জয়সিংহ।	কিন্তু তাতে আপনার কী লাভ হত? সম্রাট দারা হোন, সুজা হোন বা ঔরংজীব হোন—আপনার কী?
যশোবন্ত।	প্রতিশোধ!—আমি তাদের সব বিষচক্ষে দেখি; কিন্তু সবচেয়ে বিষচক্ষে দেখি—এই খল ঔরংজীবকে।

জয়সিংহ। তবে আপনি খিজুয়া-যুদ্ধে তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন কেন?

যশোবন্ত। সেদিন দিল্লির রাজসভায় তার সমস্ত কথায় বিশ্বাস করেছিলাম। হঠাৎ এমন মহত্ত্বের ভান করলে, এমন ত্যাগের অভিনয় করলে, এমন আন্তরিক দৈন্য আবৃত্তি করলে যে আমি চমৎকৃত হয়ে গেলাম! ভাবলাম—'এ কী! আমার আজন্ম ধারণা, আমার প্রকৃতিগত বিশ্বাস কি সব ভুল! এমন ত্যাগী, মহৎ, উদার, ধার্মিক মানুষকে আমি পাপী কল্পনা করেছিলাম!' এমন ভোজবাজি খেললে-যে সর্বপ্রথম আমিই চেঁচিয়ে উঠলাম, 'জয় ঔরংজীবের জয়!' তার সেদিনকার জয় নর্মদা কি খিজুয়া-যুদ্ধ জয়ের চেয়েও অদ্ভুত; কিন্তু সেদিন খিজুয়া-যুদ্ধক্ষেত্রে আবার আসল মানুষটা দেখলাম—সেই কূট, খল, চক্রী, ঔরংজীব।

জয়সিংহ। মহারাজ! খিজুয়া-ক্ষেত্রে আপনার প্রতি রূঢ় আচরণের জন্য সম্রাট পরে যথার্থই অনুতপ্ত হয়েছিলেন!

যশোবন্ত। এই কথা আমায় বিশ্বাস করতে বলেন মহারাজ!

জয়সিংহ। কিন্তু সে-কথা যাক; সম্রাট তার জন্য আপনার কাছে ক্ষমাও চান না, ক্ষমা ভিক্ষাও চান না। তিনি বিবেচনা করেন যে, আপনার আচরণে সে অন্যায়ের শোধ হয়ে গিয়েছে। তিনি আপনার সাহায্য চান না। তিনি চান যে, আপনি দারার পক্ষও নেবেন না, ঔরংজীবের পক্ষও নেবেন না। বিনিময়ে তিনি আপনাকে গুর্জর রাজ্য দিবেন—এইমাত্র। আপনি একটা কল্পিত অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে নিজের শক্তি ক্ষয় করে ক্রয় করবেন—ঔরংজীবের বিদ্বেষ। আর হাত গুটিয়ে বসে দেখার বিনিময়ে পাবেন, একটা প্রকাণ্ড উর্বর সুবা—গুর্জর। বেছে নেন। আপনার সর্বস্ব দিয়ে প্রতিহিংসা নিতে চান—নেন। এ সহজ ব্যবসার কথা, শুদ্ধ কেনাবেচা—দেখুন!

যশোবন্ত। কিন্তু দারা—

জয়সিংহ। দারা আপনার কে? সেও মুসলমান, ঔরংজীবও মুসলমান। আপনি যদি নিজের দেশের জন্য যুদ্ধ করতে যেতেন তো আমি কথাটি কইতাম না! কিন্তু দারা আপনার কে? আপনি কার জন্য রাজপুত রক্তপাত করতে যাচ্ছেন? দারাই যদি জয়ী হয়—তাতে আপনারই বা কী লাভ, আপনার জন্মভূমিরই বা কী লাভ?

যশোবন্ত। তবে আসুন, আমরা দেশের জন্য যুদ্ধ করি! মেবারের রাণা রাজসিংহ, বিকানীরের মহারাজ আপনি, আর আমি যদি মিলিত হই—তো এই তিন জনেই মোগল-সাম্রাজ্য ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে পারি আসুন।

জয়সিংহ। তারপরে সম্রাট হবেন কে?

যশোবন্ত। কে! রাণা রাজসিংহ।

জয়সিংহ। আমি ঔরংজীবের প্রভুত্ব মানতে পারি, কিন্তু রাজসিংহের প্রভুত্ব স্বীকার করতে পারি না।

যশোবন্ত। কেন মহারাজ? তিনি স্বজাতি বলে?

জয়সিংহ। তা বৈকি। জাতির দুর্বাক্য সইব না! আমি কোনো উচ্চ প্রবৃত্তির ভান করি না! সংসার আমার কাছে একটা হাট। যেখানে কম দামে বেশি পাব সেইখানেই যাব। ঔরংজীব কম দামে বেশি দিচ্ছে। এই ধ্রুব সম্পদ ত্যাগ করে অনিশ্চিতের মধ্যে যেতে চাই না।

যশোবন্ত। হুঁ!—আচ্ছা মহারাজ। আপনি বিশ্রাম করুন গে। আমি ভেবে কাল উত্তর দিব।

জয়সিংহ। সে উত্তম কথা। ভেবে দেখবেন।—এ শুদ্ধ সাংসারিক কেনা বেচা! আজ আমরা স্বাধীন রাজা না হতে পারি, রাজভক্ত প্রজা তো হতে পারি। রাজভক্তিও ধর্ম্ম।

[প্রস্থান]

যশোবন্ত। হিন্দুর সাম্রাজ্য কবির স্বপ্ন। হিন্দুর প্রাণ বড়ই শুষ্ক, বড়ই হিম হয়ে গিয়েছে। আর পরস্পর জোড়া লাগে না। 'স্বাধীন রাজা না হতে পারি, রাজভক্ত প্রজা তো হতে পারি।' ঠিক বলেছ জয়সিংহ! কার জন্য যুদ্ধ করতে যাব। দারা আমার কে?—নর্ম্মদার প্রতিশোধ খিজুয়ায় নিয়েছি।

মহামায়ার প্রবেশ

মহামায়া। একে প্রতিশোধ বলো মহারাজ! আমি এতক্ষণ অন্তরালে দাঁড়িয়ে এই অপৌরুষ—সমভার নিক্তির আধারের মতো এই আন্দোলন দেখছি!—খাসা! চমৎকার! বেশ বুঝে গেলে যে প্রতিশোধ নিয়েছ। একে প্রতিশোধ বলো মহারাজ? ঔরংজীবের পক্ষ হয়ে তার শিবির লুট করে পালানোর নাম প্রতিশোধ? এর চেয়ে-যে পরাজয় ছিল ভালো। এ-যে পরাজয়ের উপর পাপের ভার। রাজপুতজাতি-যে বিশ্বাসঘাতক হতে পারে তা তুমিই এই প্রথম দেখালে!

যশোবন্ত। লুঠ করবার আগে আমি ঔরংজীবের পক্ষ পরিত্যাগ করেছি মহামায়া।

মহামায়া। আর তার পশ্চাতে তার সম্পত্তি লুঠ করেছ।

যশোবন্ত। যুদ্ধ করে লুঠ করেছি, অপহরণ করি নাই।

মহামায়া। একে যুদ্ধ বলো?—ধিক!

যশোবন্ত। মহামায়া! তোমার এই ছাড়া কি আর কথা নাই? দিবারাত্র তোমার তিক্ত ভর্ৎসনা শুনবার জন্যই কি তোমায় বিবাহ করেছিলাম?

মহামায়া। নহিলে বিবাহ করেছিলেন কেন মহারাজ?

যশোবন্ত। কেন! আশ্চর্য প্রশ্ন!—লোকে বিবাহ করে আবার কেন!

মহামায়া। হাঁ, কেন? সম্ভোগের জন্য? বিলাস-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য? তাই কি?—তাই কি?

যশোবন্ত। [ঈষৎ ইতস্তত করিয়া] হাঁ—একরকম তাই বলতে হবে বৈকি।

মহামায়া। তবে একজন গণিকা রাখো না কেন?

যশোবন্ত। ঝড় উঠছে বুঝি!

মহামায়া। মহারাজ! যদি তোমার পাশবপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে চাও, যদি কামের সেবা করতে চাও তো তার স্থান কুলাঙ্গনার পবিত্র অন্তঃপুর নয়—তার স্থান বারাঙ্গনার সজ্জিত নরক। সেইখানে যাও। তুমি রৌপ্য দিবে, সে রূপ দিবে। তুমি তার কাছে যাবে লালসার তাড়নায় আর সে তোমার কাছে আসবে জঠরের জ্বালায়। স্বামী-স্ত্রীর সে সম্বন্ধ নয়।

যশোবন্ত। তবে?

মহামায়া। স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ ভালোবাসার সম্বন্ধ। সে যেমন-তেমন ভালোবাসা নয়। সে-ভালোবাসা প্রিয়জনকে দিনদিন হেয় করে না, দিনদিন প্রিয়তম করে, সে-ভালোবাসা নিজের চিন্তা ভুলে যায়, আর তার দেবতার চরণে আপনাকে বলি দেয়, সে ভালোবাসা প্রভাত সূর্যরশ্মির মতো যার উপরে পড়ে তাকেই স্বর্ণবর্ণ করে দেয়, ভাগীরথীর বারিরাশির মতো যার উপরে পড়ে তাকেই পবিত্র করে দেয়, দেবতার বরের মতো যার উপরে পড়ে তাকেই ভাগ্যবান করে—এ সেই ভালোবাসা; অচঞ্চল অনুদ্বিগ্ন আনন্দময়—কারণ, উৎসর্গময়।

যশোবন্ত। তুমি আমাকে কীরকম ভালোবাসো মহামায়া?

মহামায়া। বাসি! তোমার গৌরব কোলে করে আমি মরতে পারি—তার জন্য আমার এত চিন্তা, এত আগ্রহ যে, সে গৌরব ম্লান হয়ে গেছে দেখবার আগে আমার ইচ্ছা হয় যেন আমি অন্ধ হয়ে যাই! রাজপুতজাতির গৌরব—মাড়বারের গৌরব তোমার হাতে নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে দেখবার আগে আমি মরতে চাই! আমি তোমায় এত ভালোবাসি।

যশোবন্ত। মহামায়া!

মহামায়া। চেয়ে দেখ—ঐ রৌদ্রদীপ্ত গিরিশ্রেণী—দূরে ঐ ধূসর বালুস্তূপ। চেয়ে দেখ—ঐ পর্বতস্রোতস্বতী—যেন সৌন্দর্যে কাঁপছে। চেয়ে দেখ—ঐ নীল আকাশ, যেন সে নীলিমা নিংড়ে বার করছে! ঐ ঘুঘুর ডাক শোনো আর সঙ্গে সঙ্গে ভাবো যে এইস্থানে একদিন দেবতারা বাস করতেন। মাড়বার আর মেবার বীরত্বের যমজপুত্র; মহত্ত্বের নৈশাকাশে বৃহস্পতি ও শুক্র তারা। ধীরে ধীরে সে-মহিমার সমারোহ আমার সম্মুখ দিয়ে চলে যাচ্ছে। এসো চারণবালকগণ! গাও সেই গান।

যশোবন্ত। মহামায়া!

মহামায়া। কথা কয়ো না। ঐ ইচ্ছা যখন আমার মনে আসে আমার মনে হয় যে তখন আমার পূজার সময়! শঙ্খ ঘণ্টা বাজাও; কথা কয়ো না।

যশোবন্ত। নিশ্চয় মস্তিষ্কের কোনো রোগ আছে!

[ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন]

মহামায়া। কে তুমি সুন্দর, সৌম্য, শান্ত, আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালে! [চারণবালকগণের প্রবেশ] গাও বালকগণ! সেই গান গাও—আমার জন্মভূমি।

বালকদিগের প্রবেশ ও গীত

ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা;
তাহার মাঝে আছে দেশ এক—সকল দেশের সেরা;
ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে-দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা;
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল দেশের রানী সে যে—আমার জন্মভূমি।
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা, কোথায় উজল এমন ধারা!
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ এমন কালো মেঘে!
তার পাখির ডাকে ঘুমিয়ে উঠি
পাখির ডাকে জেগে—
এমন দেশটি ইত্যাদি—
এমন স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধুম্র পাহাড়!
কোথায় এমন হরিৎক্ষেত্র আকাশতলে মেশে।
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায়
বাতাস কাহার দেশে।
এমন দেশটি ইত্যাদি—
পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী; কুঞ্জে কুঞ্জে
গাহে পাখি,
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে খেয়ে—
তারা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে
ফুলের মধু খেয়ে!
ভায়ের মায়ের এত স্নেহ
কোথায় গেলে পাবে কেহ?
—ওমা তোমার চরণদুটি বক্ষে আমার ধরি
আমার এই দেশেতে জন্ম—
যেন এই দেশেতে মরি—
এমন দেশটি ইত্যাদি—

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—টাণ্ডায় সুজার প্রাসাদকক্ষ। কাল—সন্ধ্যা।

পিয়ারা গাহিতেছিলেন

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম!
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ।
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে।

সুজার প্রবেশ

সুজা। শুনেছ পিয়ারা, যে, দারা ঔরংজীবের কাছে শেষ যুদ্ধেও পরাজিত হয়েছেন?

পিয়ারা। হয়েছেন নাকি!

সুজা। ঔরংজীবের শ্বশুর তরোয়াল হাতে দারার পক্ষে লড়ে মারা গিয়েছে—খুব জমকালো রকম না?

পিয়ারা। বিশেষ এমন কী।

সুজা। নয়? বৃদ্ধ যোদ্ধা নিজের জামাই-এর বিপক্ষে লড়ে মারা গেল—শুদ্ধ ধর্মের খাতিরে। সোভানাল্লা!

পিয়ারা। এতে আমি 'কেয়াবৎ' পর্যন্ত বলতে রাজি আছি। তার উপরে উঠতে রাজি নই।

সুজা। যশোবন্ত সিংহ যদি এবার দারার সঙ্গে সসৈন্যে যোগ দিত—তা দিলে না। দারাকে সাহায্য করতে স্বীকৃত হয়ে শেষে কিনা পিছু হটলে।

পিয়ারা। আশ্চর্য তো!

সুজা। এতে আশ্চর্য হচ্ছ কী পিয়ারা? এতে আশ্চর্য হবার কিছু নাই।

পিয়ারা। নেই নাকি? আমি ভাবলাম বুঝি আছে; তাই আশ্চর্য হচ্ছিলাম।

সুজা। মহারাজ যেমন এই খিজুয়া-যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, এবার দারাকে ঠিক সেইরকম প্রতারণা করেছে। এর মধ্যে আবার আশ্চর্য কী!

পিয়ারা। তা আর কী—আমি আশ্চর্য হচ্ছি—

সুজা। আবার আশ্চর্য!

পিয়ারা। না না! তা নয়। আগে শেষপর্যন্ত শোনোই।

সুজা। কী?

পিয়ারা। আমি এই ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি—যে আগে আশ্চর্য হচ্ছিলাম কী ভেবে?

সুজা। আশ্চর্য যদি বলো, তবে আশ্চর্য হবার ব্যাপার একটা হয়েছে।

পিয়ারা। সেটা হচ্ছে কী?

সুজা। সেটা হচ্ছে এই যে, ঔরংজীবের পুত্র মহম্মদ, আমার মেয়ের জন্য তার বাপের পক্ষ ছেড়ে আমার পক্ষে যোগ দিল কী ভেবে।

পিয়ারা। তার মধ্যে আশ্চর্য কী! প্রেমের জন্য লোকে এর চেয়ে অনেক বেশি শক্ত কাজ করেছে। প্রেমের জন্য লোকে পাঁচিল টপকেছে, ছাদ থেকে লাফিয়েছে, সাঁতারে নদী পার হয়েছে, আগুনে ঝাঁপ দিয়েছে, বিষ খেয়ে মরেছে! এটা তো একটা তুচ্ছ ব্যাপার! বাপকে ছেড়েছে। ভারি কাজ করেছে। ও তো সবাই করে। আমি এতে আশ্চর্য হতে রাজি নই।

সুজা। কিন্তু—না—এ বেশ একটু আশ্চর্য! সে যাহোক কিন্তু মহম্মদ আর আমি মিলে এবারে ঔরংজীবের সৈন্যকে বঙ্গদেশ থেকে তাড়িয়েছি।

পিয়ারা। তোমার কি যুদ্ধ ভিন্ন কথা নাই। আমি যত তোমায় ভুলিয়ে রাখতে চাই, তুমি ততই শিষ্‌পা তোলো। রাশ মানতে চাও না।

সুজা। যুদ্ধে একটা বিরাট আনন্দ আছে। তার উপরে—

বাঁদীর প্রবেশ

বাঁদী। এক ফকির দেখা করতে চায় জাঁহাপনা।

পিয়ারা। কীরকম ফকির—লম্বা দাড়ি?

বাঁদী। হাঁ মা! সে বলে যে বড় দরকার, এক্ষণই!

সুজা। আচ্ছা, এখানেই নিয়ে এসো।—পিয়ারা তুমি ভেতরে যাও।

পিয়ারা। বেশ তুমি আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছ। বেশ। আমি যাচ্ছি!

[প্রস্থান]

সুজা। যাও, এখানে তাকে পাঠিয়ে দাও।

[বাঁদীর প্রস্থান]

সুজা। পিয়ারা এক হাস্যের ফোয়ারা—একটা অর্থশূন্য বাক্যের নদী। এইরকম করে সে আমাকে যুদ্ধের চিন্তা থেকে ভুলিয়ে রাখে।

দিলদারের প্রবেশ

দিলদার। বন্দেগি শাহাজাদা! শাহাজাদার একখানি চিঠি!

পত্র প্রদান

সুজা। [পত্র লইয়া খুলিয়া পাঠ] এ কী! তুমি কোথা থেকে এসেছ?

দিলদার। পত্রে দস্তখত নেই কি শাহাজাদা!—চেহারা দেখলেই শাহাজাদার বুদ্ধি টের পাওয়া যায়! খুব চাল চেলেছেন।

সুজা। কী চাল?

দিলদার। শাহাজাদা যে সুজার মেয়ে বিয়ে করে—উহ্—খুব ফিকির করেছেন। সম্মুখ থেকে তীর মারার চেয়ে পিছনদিক থেকে—উহ্! বাপকা বেটা কি না।

সুজা। পিছন থেকে তীর মারছে কে?

দিলদার। ভয় কী—আমি কি এ-কথা সুজা সুলতানকে বলতে যাচ্ছি। চিঠিটা যেন তাঁকে ভুলে দেখিয়ে ফেলবেন না শাহাজাদা!

সুজা। আরে ছাই আমিই যে সুলতান সুজা; মহম্মদ তো আমার জামাই।

দিলদার। বটে! চেহারা তো বেশ যুবাপুরুষের মতো রেখেছেন। শুনুন—বেশি চালাকি করবেন না। আপনি যদি মহম্মদ হন যা বলছি ঠিক বুঝতে পারছেন। আর-যদি সুলতান সুজা হন, তো যা বলছি তার বর্ণও সত্য নয়।

সুজা। আচ্ছা, তুমি এখন যাও। এর বিহিত আমি এখনই করছি—তুমি বিশ্রাম করো গে যাও।

দিলদার। যে আজ্ঞে।

[দিলদারের প্রস্থান]

সুজা। এ তো মহাসমস্যায় পড়লাম! বাহিরের শত্রুর জ্বালায়ই অস্থির, তার উপর ঔরংজীব আবার ঘরে শত্রু লাগিয়েছেন। কিন্তু যাবে কোথায়! হাতে হাতে ব্যবস্থা করছি। ভাগ্যিস এই পত্র আমার হাতে পড়েছিল—এই যে মহম্মদ।

মহম্মদের প্রবেশ

সুজা। মহম্মদ! পড়ো এই পত্র।

মহম্মদ। [পড়িয়া] এ কী! এ কার পত্র?

সুজা। তোমার পিতার! স্বাক্ষর দেখছ না? তুমি ঈশ্বরকে সাক্ষী করে তাঁকে পত্র লিখেছিলে যে, তুমি-যে তোমার পিতার বিরুদ্ধাচরণ করেছ, সে অন্যায় তোমার শ্বশুরের অর্থাৎ আমার প্রতি শাঠ্য দিয়ে পরিশোধ করবে।

মহম্মদ। আমি তাঁকে কোনো পত্রই লিখিনি। এ কপট পত্র।

সুজা। বিশ্বাস করতে পারলাম না! তুমি আজই এই দণ্ডে আমার বাড়ি পরিত্যাগ করো।

মহম্মদ। সে কী! কোথায় যাব?

সুজা। তোমার পিতার কাছে।

মহম্মদ। কিন্তু আমি শপথ করছি—

সুজা। না, ঢের হয়েছে—আমি সম্মুখযুদ্ধে পারি কি হারি—সে স্বতন্ত্র কথা। ঘরে শত্রু পুষতে পারি না।

মুহম্মদ। আমি—

সুজা। কোনো কথা শুনতে চাই না। যাও, এখনি যাও।

[মহম্মদের প্রস্থান]

সুজা। হাতে হাতে ব্যবস্থা করেছি। ভারি বুদ্ধি করেছিলে দাদা; কিন্তু যাবে কোথায়! তুমি বেড়াও ডালে ডালে, আর আমি বেড়াই পাতায় পাতায়!—এই যে পিয়ারা।

পিয়ারার প্রবেশ

সুজা। পিয়ারা! ধরে ফেলেছি।

পিয়ারা। কাকে?

সুজা। মহম্মদকে। বেটা মতলব ফেঁদে এসেছিল। তোমাকে এখনি বলছিলাম না যে, এ বেশ একটু খটকা! এখন সেটা বোঝা যাচ্ছে। জলের মতো সাফ হয়ে গিয়েছে। তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি।

পিয়ারা। কাকে?

সুজা। মহম্মদকে।

পিয়ারা। সে কী!

সুজা। বাইরে শত্রু, ঘরে শত্রু—ধন্য ভায়া—বুদ্ধি করেছিলে বটে। কিন্তু পারলে না। ভারি ধরেছি!—এই দেখ পত্র!

পিয়ারা। [পত্র পড়িয়া] তোমার মাথা খারাপ হয়েছে। হাকিম দেখাও।

সুজা। কেন?

পিয়ারা। এ ছল-কপটপত্র বুঝতে পারছি না? ঔরংজীবের ছল। এইটে বুঝতে পারছ না?

সুজা। না, সেটা ঠিক বুঝতে পারছিনে।

পিয়ারা। এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি গিয়েছ—ঔরংজীবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। হেলে ধরতে পারো না, কেউটে ধরতে যাও। তা আমাকে একবার জিজ্ঞাসাও করলে না; জামাইকে দিলে তাড়িয়ে। চলো, এখন মেয়ে জামাইকে বোঝাইগে।

সুজা। পত্র কপট? তাই নাকি? কই তা তো তুমি বললে না—তা সাবধান হওয়া ভালো।

পিয়ারা। তাই জামাইকে দিলে তাড়িয়ে!

সুজা। তাই তো। তাহলে ভারি ভুল হয়ে গিয়েছে বলতে হবে। যা হোক শোনো এক ফিকির করেছি। মেয়েকে তার সঙ্গে দিচ্ছি। আর যথারীতি যৌতুক দিচ্ছি। দিয়ে মেয়েকে তার সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি পাঠাচ্ছি, এতে দোষ নাই। ভয় কী—চলো জামাইকে তাই বুঝিয়ে বলি। তাই বলে তাকে বিদায় দেই।

পিয়ারা। কিন্তু বিদায় দেবে কেন?

সুজা। সময় খারাপ। সাবধান হওয়া ভালো। বোঝো না—চলো বোঝাইগে।

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত]

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—জিহন খাঁর গৃহের দরবার-কক্ষ।
কাল—রাত্রি।

সিপার ও জহরৎ দণ্ডায়মান

জহরৎ। সিপার!

সিপার। কী জহরৎ!

জহরৎ। দেখছ!

সিপার। কী!

জহরৎ। যে আমরা এইরকম বন্যজন্তুর মতো বন হতে বনান্তরে প্রতাড়িত; হত্যাকারীর মতো এক গহ্বর থেকে পালিয়ে আর-এক গহ্বরে গিয়ে মাথা লুকোচ্ছি; পথের ভিখারির মতো এক গৃহস্থের দ্বারে পদাহত হয়ে আর-এক গৃহস্থের দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা কুড়িয়ে বেড়াচ্ছি।—দেখছ?

সিপার। দেখছি; কিন্তু উপায় কী?

জহরৎ। উপায় কী? পুরুষ তুমি—স্থির স্বরে বলছ "উপায় কী"! আমি যদি পুরুষ হতাম, তো এর উপায় করতাম।

সিপার। কী উপায় করতে?

জহরৎ [ছোরা বাহির করিয়া] এই ছোরা নিয়ে গিয়ে দস্যু ঔরংজীবের বুকে বসিয়ে দিতাম।

সিপার। হত্যা?

জহরৎ। হ্যাঁ হত্যা; চমকে উঠলে যে?—হত্যা। নাও এই ছোরা, দিল্লি যাও। তুমি বালক, তোমায় কেউ সন্দেহ করবে না—যাও।

সিপার। কখনো না। হত্যা করব না।

জহরৎ। ভীরু! দেখছ—মা মরেছেন! দেখছ—বাবা উন্মাদের মতো হয়ে গিয়েছেন। বসে বসে দেখছ!

সিপার। কী করব!

জহরৎ। কাপুরুষ!

সিপার। আমি কাপুরুষ নই জহরৎ! আমি যুদ্ধক্ষেত্রে পিতার পার্শ্বে হস্তিপৃষ্ঠে বসে যুদ্ধ করেছি। প্রাণের ভয় করি না; কিন্তু হত্যা করব না।

জহরৎ। উত্তম!

[প্রস্থান]

সিপার। এ নিষ্ফল ক্রোধ ভগ্নি! কোনো উপায় নাই!

[প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—নাদিরার কক্ষ। কাল—রাত্রি।

খট্টাঙ্গের উপর নাদিরা শয়ানা। পার্শ্বে দারা। অন্য পার্শ্বে সিপার ও জহরৎ

দারা। নাদিরা! সংসার আমাকে পরিত্যাগ করেছে—ঈশ্বর আমায় পরিত্যাগ করেছেন। একা তুমি আমায় এতদিন পরিত্যাগ করো নাই। তুমিও আমায় ছেড়ে চললে!

নাদিরা। আমার জন্য অনেক সহ্য করেছ নাথ! আর—

দারা। নাদিরা! দুঃখের জ্বালায় ক্ষিপ্ত হয়ে তোমায় অনেক কুবাক্য বলেছি—

নাদিরা। নাথ! তোমার দুঃখের সঙ্গিনী হওয়াই আমার পরম গৌরব। সে-গৌরবের স্মৃতি নিয়ে আমি পরলোকে চললাম—সিপার-বাবা! মা-জহরৎ! আমি যাচ্ছি—

সিপার। তুমি কোথায় যাচ্ছ মা?

নাদিরা। কোথায় যাচ্ছি তা আমি জানি না। তবে যেখানে যাচ্ছি সেখানে বোধহয় কোনো দুঃখ নাই—ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা নাই, রোগ-তাপ নাই, দ্বেষ-দ্বন্দ্ব নাই।

সিপার। তবে আমরাও সেখানে যাব মা—চলো বাবা! আর সহ্য হয় না।

নাদিরা। আর কষ্ট পেতে হবে না বাছা। তোমরা জিহন খাঁর আশ্রয়ে এসেছ! আর দুঃখ নাই।

সিপার। এই জিহন খাঁ কে বাবা?

দারা। আমার একজন পুরাতন বন্ধু।

নাদিরা। তাঁকে তোমার বাবা দুবার মৃত্যু থেকে বাঁচিয়েছিলেন। তিনি তোমাদের আদর যত্ন করবেন।

সিপার। কিন্তু আমি তাকে কখনও ভালোবাসব না।

দারা। কেন সিপার?

সিপার। তার চেহারা ভালো নয়। এখনই সে তার এক চাকরকে ফিসফিস করে কী বলছিল—আর আমার দিকে এরকম চোরা চাহনি চাচ্ছিল যে আমার বড় ভয় করল মা! আমি ছুটে তোমার কাছে পালিয়ে এলাম!

দারা। সিপার সত্য বলেছে নাদিরা! জিহনের মুখে একটা কুটিল হাসি দেখেছি, তার চক্ষে একটা হিংস্র দীপ্তি দেখেছি, তার নিম্নস্বরে বোধ হচ্ছিল যেন সে একখানা ছোরা শানাচ্ছে। সেদিন যখন সে আমার পদতলে পড়ে তার প্রাণভিক্ষা চেয়েছিল, তখন সে-চেহারা একরকমের; আর এ আর-একরকমের চেহারা। এ চাহনি, এ স্বর, এ ভঙ্গিমা—আমার অপরিচিত।

নাদিরা। তবু তো তাকে তুমি দুবার বাঁচিয়েছিলে। সে মানুষ তো, সর্প তো নয়।

দারা। মানুষকে আর বিশ্বাস নেই নাদিরা। দেখছি সে সর্পের চেয়েও খল হয়! তবে মাঝে মাঝে—কি নাদিরা! বড় যন্ত্রণা হচ্ছে!

নাদিরা। না, কিছু না! আমি তোমার কাছে আছি। তোমার স্নেহদৃষ্টির অমৃতে সব যন্ত্রণা গলে যাচ্ছে; কিন্তু আমার আর সময় নেই—তোমার হাতে সিপারকে সঁপে দিয়ে গেলাম—দেখো!—পুত্র সোলেমানের সঙ্গে—আর দেখা হল না—ঈশ্বর! [মৃত্যু]

দারা। নাদিরা! নাদিরা!—না। সব হিম স্তব্ধ।

সিপার। মা! মা!

দারা। দীপ নির্বাণ হয়েছে।

জহরৎ নিজের বক্ষ সবলে চাপিয়া ঊর্ধ্বদিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। চারিজন সৈনিকসহ জিহন খাঁ'র প্রবেশ

দারা। কে তোমরা; এ সময় এ স্থানে এসে কলুষিত করো?

জিহন। বন্দি করো।

দারা। কি! আমায় বন্দি করবে জিহন খাঁ!

সিপার। [দেওয়াল হইতে তরবারি লইয়া] কার সাধ্য?

দারা। সিপার তরবারি রাখো!—এ বড় পবিত্র মুহূর্ত; এ মহাপুণ্য তীর্থ! এখনও নাদিরার আত্মা এখানে পক্ষ গুটিয়ে আছে—পৃথিবীর থেকে বিদায় নেবার পূর্বে একবার চারিদিকে চেয়ে শেষ দেখা দেখে নিচ্ছে। এখনও স্বর্গ থেকে দেবীরা তাকে সেখানে নিয়ে যাবার জন্যে এসে পৌঁছেনি! তাকে ত্যক্ত কোরো না—আমায় বন্দি করতে চাও জিহন খাঁ?

জিহন। হাঁ শাহাজাদা।

দারা। ঔরংজীবের আজ্ঞায় বোধ হয়।

জিহন। হাঁ শাহাজাদা।

দারা। নাদিরা! তুমি শুনতে পাচ্ছ না তো! তাহলে ঘৃণায় তোমার মৃতদেহ নড়ে উঠবে, তুমি নাকি ঈশ্বরকে বড় বিশ্বাস করতে!

জিহন। একে শৃঙ্খল দিয়ে বাঁধো। যদি কোনো বাধা দেন তো তরবারি ব্যবহার করতে দ্বিধা করবে না।

দারা। আমি বাধা দিচ্ছি না। আমায় বাঁধো। আমি কিছু আশ্চর্য হচ্ছি না। আমি এইরূপই একটা কিছু প্রত্যাশা করে আসছিলাম। অন্যে হয়তো অন্যরূপ আশা করত। অন্যে হয়তো ভাবত যে এ কতবড় কৃতঘ্নতা যে, যাকে আমি দুবার বাঁচিয়েছি, সে আমায় কপট আশ্রয় দিয়ে বন্দি করে—এ কতবড় নৃশংসতা। আমি তা ভাবি না। আমি জানি জগতে সব—সব উচ্চপ্রবৃত্তি সাপের ভয়ে মাটির মধ্যে মাথা লুকিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে—উপরদিকে চোখ তুলে চাইতেও সাহস করছে না। আমি জানি পৃথিবীতে ধর্ম এখন স্বার্থসিদ্ধি, নীতি—শাঠ্য, পূজা—খোশামোদ, কর্তব্য—জোচ্চোরি। উচ্চপ্রবৃত্তিগুলো এখন বড় পুরাতন হয়ে গিয়েছে। সভ্যতার আলোকে ধর্মের অন্ধকার সরে গিয়েছে! সে ধর্ম যা-কিছু আছে এখন

	বোধহয় কৃষকের কুটিরে, ভীলকোল মুণ্ডাদের অসভ্যতার মধ্যে।—করো জিহন খাঁ, আমায় বন্দি করো।
সিপার।	তবে আমায়ও বন্দি করো।
জিহন।	তোমায়ও ছাড়ছি না শাহাজাদা! সম্রাটের কাছে প্রচুর পুরস্কার পাব।
দারা।	পাবে বৈকি! এতবড় কৃতঘ্নতার দাম পাবে না? তাও কখনও হয়? প্রচুর অর্থ পাবে। আমি কল্পনায় তোমার সেই দীপ্ত মুখখানি দেখতে পাচ্ছি। কী আনন্দ!—প্রচুর অর্থ পাবে! সঙ্গে করে পরকালে নিয়ে যেও।
জিহন।	তবে আর কী—বন্দি করো।
দারা।	করো।—না এখানে না! বাইরে চলো! এ স্বর্গে নরকের অভিনয় কেন! এতবড় অভিনয় এখানে! মা বসুন্ধরা! এতখানি বহন করছ! নীরবে সহ্য করছ ঈশ্বর! হাত দুখানি গুটিয়ে বেশ এইসব দেখছ।—চলো জিহন খাঁ, বাইরে চলো।

সকলে যাইতে উদ্যত

দারা।	দাঁড়াও, একটা অনুরোধ করে যাই জিহন খাঁ! রাখবে কি? জিহন খাঁ, এই দেবীর মৃতদেহ লাহোরে পাঠিয়ে দিও! সেখানে সম্রাট-পরিবারের কবরভূমিতে যেন তাকে গোর দেওয়া হয়। দেবে কি? আমি তোমাকে দুবার বাঁচিয়েছি বলেই এ দান ভিক্ষা চাইছি। নইলে এতটুকুও তোমার কাছে চাইতে পারতাম না—দেবে কি?
জিহন।	যে আজ্ঞে যুবরাজ! এ কাজ না করলে আমার প্রভু ঔরংজীব যে ক্রুদ্ধ হবেন!
দারা।	তোমার প্রভু ঔরংজীব! হুঁ—আমার আর কোনো ক্ষোভ নাই! চলো—[ফিরিয়া] নাদিরা!
	এই বলিয়া দারা ফিরিয়া আসিয়া সহসা নাদিরার শয্যাপার্শ্বে জানু পাতিয়া বসিয়া হস্তদ্বয়ের উপর মুখ ঢাকিলেন, পরে উঠিয়া জিহন খাঁকে কহিলেন—"চলো জিহন খাঁ!"
	সকলে বাহিরে চলিলেন। সিপার নাদিরার মৃতদেহের প্রতি চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিল
দারা।	[রুক্ষভাবে] সিপার!

[সিপারের রোদন ভয়ে থামিয়া গেল।
সকলে নীরবে বাহিরে চলিয়া গেলেন]

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—যোধপুরের প্রাসাদ। কাল—সায়াহ্ন।

যশোবন্ত সিংহ ও মহামায়া দণ্ডায়মান

মহামায়া।	হতভাগ্য দারার প্রতি কৃতঘ্নতার পুরস্কারস্বরূপ গুর্জর প্রদেশ পেয়ে সন্তুষ্ট আছ তো মহারাজ!

যশোবন্ত। তাতে আমার অপরাধ কী মহামায়া?

মহামায়া। না অপরাধ কী? এ তোমার মহৎ সম্মান, পরম গৌরব।

যশোবন্ত। গৌরব না হতে পারে, তবে তার মধ্যে অন্যায় আমি কিছু দেখিনি। দারার সঙ্গে যোগ দেওয়া না-দেওয়া আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা। দারা আমার কে?

মহামায়া। আর কেউ নয়—প্রভু মাত্র।

যশোবন্ত। প্রভু! এককালে ছিলেন বটে; আর কেউ নয়।

মহামায়া। সত্যই তো! দারা আজ নিয়তিচক্রের নিচে, ভাগ্যের লাঞ্ছিত, মানবের ধিকৃত। আর তাঁর সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কী? দারা তোমার প্রভু ছিলেন—যখন তিনি পুরস্কার দিতে পারতেন, বেত্রাঘাত করতে পারতেন।

যশোবন্ত। আমাকে!

মহামায়া। হায় মহারাজ! 'ছিলেন'-এর কি কোনো মূল্য নাই? অতীতকে কি একেবারে লুপ্ত করে দিতে পারো? একদিন যিনি তোমার দয়াল প্রভু ছিলেন, আজ তোমার কাছে কি তাঁর কোনো মূল্য নাই? ধিক!

যশোবন্ত। মহামায়া! তোমার সঙ্গে আমার তর্ক করবার সম্বন্ধ নয়। আমি যা উচিত বিবেচনা করছি তাই করে যাচ্ছি। তোমার কাছে উপদেশ চাই না।

মহামায়া। তা চাইবে কেন? যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ফিরে এসে, বিশ্বাসঘাতক হয়ে ফিরে এসে, কৃতঘ্ন হয়ে ফিরে এসে—তুমি চাও আমার ভক্তি! না?

যশোবন্ত। সে কি বড়বেশি প্রত্যাশা মহামায়া!

মহামায়া। না সম্পূর্ণ স্বাভাবিক! ক্ষত্রিয় বীর তুমি—ক্ষত্রকুলের অবমাননা করেছ! জানো, সমস্ত রাজপুতনা তোমায় ধিক্কার দিচ্ছে। বলছে যে ঔরংজীবের শ্বশুর সাহ নাবাজ দারার পক্ষ হয়ে তার জামাতার বিপক্ষে যুদ্ধ করে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করল, আর তুমি দারাকে আশা দিয়ে শেষে কাপুরুষের মতো সরে দাঁড়ালে!—হায় স্বামী! কী বলব, তোমার এই অপমানে আমার শিরায় অগ্নিস্রোত বয়ে যাচ্ছে; কিন্তু সে-অপমান তোমাকে স্পর্শও করছে না! আশ্চর্য বটে!

যশোবন্ত। মহামায়া—

মহামায়া। আর কেন! যাও, তোমার প্রভু ঔরংজীবের কাছে যাও।

[সরোষে প্রস্থান]

যশোবন্ত। উত্তম! তাই হবে। এতদূর অবজ্ঞা! বেশ তাই হবে।

[প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—আগ্রার প্রাসাদে সাজাহানের কক্ষ।
কাল—রাত্রি।

সাজাহান ও জাহানারা

সাজাহান। আবার কী দুঃসংবাদ কন্যা। আর কী বাকি আছে? দারা আবার পরাজিত হয়ে বাখরের দিকে পালিয়েছে। সুজা বন্য আরাকান রাজার গৃহে সপরিবারে ভিক্ষুক! মোরাদ গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দি। আর কী দুঃসংবাদ দিতে পারো কন্যা?

জাহানারা। বাবা! এ আমারই দুর্ভাগ্য যে আমিই আপনার নিকট রোজ দুঃসংবাদের বস্তা বহে আনি; কিন্তু কী করব বাবা! দুর্ভাগ্য একা আসে না!

সাজাহান। বলো। আর কী?

জাহানারা। বাবা, ভাই দারা ধরা পড়েছে।

সাজাহান। ধরা পড়েছে?—কীরকমে ধরা পড়ল?

জাহানারা। জিহন খাঁ তাকে ধরিয়ে দিয়েছে।

সাজাহান। জিহন খাঁ! জিহন খাঁ! কী বলছিস জাহানারা? জিহন খাঁ!

জাহানারা। হাঁ বাবা।

সাজাহান। পৃথিবীর কি অন্তিম সময় ঘনিয়ে এসেছে!

জাহানারা। শুনলাম, পরশু দারা আর তার পুত্র সিপারকে এক কঙ্কালসার হাতির পিঠে বসিয়ে দিল্লিনগর প্রদক্ষিণ করিয়ে আনা হয়েছে। তাদের পরিধানে ময়লা শাদা কাপড়। তাদের এই অবস্থা দেখে সেই রাজপুরীর একটি লোক নেই যে কাঁদেনি।

সাজাহান। তবু তাদের মধ্যে কেউ দারাকে উদ্ধার করতে ছুটল না? কেবল শশকের মতো ঘাড় উঁচু করে দেখলে? তারা কি পাষাণ?

জাহানারা। না বাবা। পাষাণও উত্তপ্ত হয়। ঔরংজীবের ভাড়া-করা বন্দুকগুলি দেখে তারা সব ত্রস্ত; যেন একটা জাদুকরের মন্ত্রমুগ্ধ; কেউ মাথা তুলতে সাহস করছে না। কাঁদছে—তাও মুখ লুকিয়ে—পাছে ঔরংজীব দেখতে পায়।

সাজাহান। তারপর?

জাহানারা। তারপর ঔরংজীব দারাকে খিজিরাবাদে একটা জঘন্য গৃহে বন্দি করে রেখেছে।

সাজাহান। আর সিপার আর জহরৎ?

জাহানারা। সিপার তার পিতার সঙ্গ ছাড়েনি। জহরৎ এখন ঔরংজীবের অন্তঃপুরে।

সাজাহান। ঔরংজীব এখন দারাকে নিয়ে কী করবে জানিস?

জাহানারা। কী করবে তা জানি না—কিন্তু—কিন্তু—

সাজাহান। কী জাহানারা!

জাহানারা। যদি তাই করে বাবা!

সাজাহান। কী! কী জাহানারা? মুখ ঢাকছিস যে! তা কি সম্ভব!—ভাই কি ভাইকে হত্যা করবে?

জাহানারা। চুপ। ও কার পদশব্দ! শুনতে পেয়েছে!—বাবা আপনি কী করলেন। কি করলেন!

সাজাহান। কী করেছি?

জাহানারা। ও-কথা উচ্চারণ করলেন!—আর রক্ষা নাই।

সাজাহান। কেন?

জাহানারা। হয়তো ঔরংজীব দারাকে হত্যা করত না। হয়তো এতবড় পাতক তারও মনে আসত না; কিন্তু আপনি সে-কথা তার মনে করিয়ে দিলেন! কী করলেন! কী করলেন! সর্বনাশ করেছেন!

সাজাহান। ঔরংজীব তো এখানে নাই! কে শুনেছে?

জাহানারা। সে নাই, কিন্তু এই দেওয়াল তো আছে, বাতাস তো আছে, এই প্রদীপ তো আছে। আজ সব-যে তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। আপনি ভাবছেন যে এ আপনার প্রাসাদ?—না, ঔরংজীবের পাষাণ হৃদয়! ভাবছেন এ বাতাস? তা নয়, এ ঔরংজীবের বিষাক্ত নিশ্বাস! এ প্রদীপ নয়—এ তার চক্ষের জল্লাদ দৃষ্টি। এ প্রাসাদে, এ রাজপুরে, এ সাম্রাজ্যে, আপনার আমার এক বন্ধু আছে ভেবেছেন বাবা? না, নেই। সব তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। সব খোশামুদের দল! জোচ্চোরের দল!—এ কার ছায়া?

সাজাহান। কে?

জাহানারা। না কেউ নয়। ওদিকে কী দেখছেন বাবা!

সাজাহান। দেব লাফ?

জাহানারা। সে কী বাবা!

সাজাহান। দেখি যদি দারাকে রক্ষা করতে পারি।—তাকে তারা হত্যা করতে যাচ্ছে। আর আমি এখানে নারীর মতো, শিশুর মতো নিরুপায়। চোখের উপরে এই দেখছি অথচ খাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি, বেঁচে রয়েছি, কিছু করছি না!—দেই লাফ।

জাহানারা। সে কী বাবা! এখান থেকে লাফ দিলে যে নিশ্চিত মৃত্যু!

সাজাহান। হলেই বা! দেখি যদি বাঁচাতে পারি।—যদি পারি।

জাহানারা। বাবা! আপনি জ্ঞান হারিয়েছেন? মরে গেলে আর দারাকে রক্ষা করবেন কী করে?

সাজাহান। তা বটে! তা বটে! আমি মরে গেলে দারাকে বাঁচাব কী করে? ঠিক বলেছিস। তবে—তবে—আচ্ছা একবার ঔরংজীবকে এখানে নিয়ে আসতে পারিসনে জাহানারা?

জাহানারা। না বাবা, সে আসবে না। নইলে আমি যে নারী—আমি তার সঙ্গে হাতে হাতে লড়ে দেখতাম। সেদিন মুখোমুখি হয়ে পড়েছিলাম, কিছু করতে

পারিনি; সেইজন্য আমার পর্যন্ত আর বাইরে যাবার হুকুম নেই। নইলে একবার হাতে হাতে লড়ে দেখতাম।

সাজাহান। দিই লাফ! দেব লাফ?

লম্ফ প্রদানে উদ্যত

জাহানারা। বাবা, উন্মত্ত হবেন না।

সাজাহান। সত্যই তো আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি নাকি!—না না না। আমি পাগল হব না। ঈশ্বর! এই শীর্ণ দুর্বল জরাজীর্ণ দেহাতই অসহায়, সাজাহানকে দেখ ঈশ্বর! তোমার দয়া হচ্ছে না? দয়া হচ্ছে না? পুত্র পিতাকে বন্দি করে রেখেছে—যে পুত্র তার ভয়ে একদিন কাঁপত—এতখানি অবিচার, এতখানি অত্যাচার, এতখানি অস্বাভাবিক ব্যাপার তোমার নিয়মে সইছে? সইতে পারছে! আমি এমন কী পাপ করেছিলাম খোদা—যে আমার নিজের পুত্র—ওহ্!

জাহানারা। একবার যদি এখন তাকে মুখোমুখি পাই তা হলে—

দন্তঘর্ষণ

সাজাহান। মমতাজ! বড় ভাগ্যবতী তুমি, যে, এ মর্মন্তুদ দৃশ্য তোমায় দেখতে হচ্ছে না। বড় পুণ্যবতী তুমি, তাই আগেই মরে গিয়েছ।—জাহানারা!

জাহানারা! বাবা!

সাজাহান। তোকে আশীর্বাদ করি—

জাহানারা। কী বাবা?

সাজাহান। যেন তোর পুত্র না হয়, শত্রুরও যেন পুত্র না হয়।

[এই বলিয়া সাজাহান চলিয়া গেলেন। জাহানারা বিপরীত দিকে চলিয়া গেলেন।]

ষষ্ঠ দৃশ্য

ঔরংজীব একখানি পত্রিকা হস্তে বেড়াইতেছিলেন

ঔরংজীব। এই দারার মৃত্যুদণ্ড।—এ কাজির বিচার!—আমার অপরাধ কী!—আমি কিন্তু—না, কেন—এ বিচার! বিচারকে কলুষিত করব কেন! এ বিচার!

দিলদারের প্রবেশ

দিলদার। এ হত্যা!

ঔরংজীব। [চমকিয়া] কে!—দিলদার!—তুমি এখানে?

দিলদার। আমি ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় আছি জাঁহাপনা। দেখে নেবেন। আর আমি যদি এখানে না-থাকতাম, তা হলেও এ হত্যা—

ঔরংজীব। [কম্পিত স্বরে] হত্যা!—না দিলদার, এ কাজির বিচার!

দিলদার। সম্রাট স্পষ্ট কথা বলব?

ঔরংজীব। বলো!

দিলদার। সম্রাট! আপনি হঠাৎ কেঁপে উঠলেন যে! আপনার স্বর যেন শুষ্ক বাতাসের উচ্ছ্বাসের মতো বেরিয়ে এল। কেন জাঁহাপনা! সত্যকথা বলব?

ঔরংজীব। দিলদার!

দিলদার। সত্যকথা—আপনি দারার মৃত্যু চান।

ঔরংজীব। আমি?

দিলদার। হাঁ—আপনি।

ঔরংজীব। কিন্তু এ কাজির বিচার।

দিলদার। বিচার! জাঁহাপনা, সে কাজিরা যখন দারার মৃত্যুদণ্ড উচ্চারণ করছিল, তখন তারা ঈশ্বরের মুখের দিকে চেয়ে ছিল না। তখন তারা জাঁহাপনার সহাস্য মুখখানি কল্পনা করছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে তাদের গৃহিণীদের নূতন অলঙ্কারের ফর্দ করছিল। বিচার! যেখানে মাথার উপর প্রভুর আরক্ত চক্ষু চেয়ে আছে, সেখানে আবার বিচার! জাঁহাপনা ভাবছেন যে সংসারকে খুব ধাপ্পা দিলেন। সংসার কিন্তু মনে মনে খুব বুঝল; কেবল ভয়ে কথাটি কইল না! জোর করে মানুষের বাকরোধ করতে পারেন, তাকে গলা টিপে মেরে ফেলতে পারেন; কিন্তু কালোকে শাদা করতে পারেন না। সংসার জানবে, ভবিষ্যৎ জানবে যে বিচারের ছল করে আপনি দারাকে হত্যা করিয়েছেন—আপনার সিংহাসনকে নিরাপদ করবার জন্য।

ঔরংজীব। সত্য না কি!—দিলদার তুমি সত্যকথা বলেছ! তুমি আজ দারাকে বাঁচালে! তুমি আমার পুত্র মহম্মদকে ফিরিয়ে দিয়েছ। আজ আমার ভাই দারাকে বাঁচালে! যাও, শায়েস্তা খাঁকে ডেকে দাও।

[দিলদারের প্রস্থান]

দারা বাঁচুন, আমায় যদি তার জন্য সিংহাসন দিতে হয় দেব! এতখানি পাপ—যাক্, এ মৃত্যুদণ্ড ছিঁড়ে ফেলি—[ছিঁড়িতে উদ্যত] না, এখন না। শায়েস্তা খাঁর সম্মুখে এটা ছিঁড়ে এ মহত্ত্বটুকু কাজে লাগাব—এই যে শায়েস্তা খাঁ।

শায়েস্তা খাঁ ও জিহন খাঁর প্রবেশ ও অভিবাদন

সেনাপতি! বিচারে ভাই দারার প্রাণদণ্ড হয়েছে।

জিহন। ঐ বুঝি সেই দণ্ডাজ্ঞা? আমাকে দেন খোদাবন্দ, আমি নিজে কাজ হাসিল করে আসছি! কাফেরের প্রাণদণ্ড নিজে হাতে দেবার জন্য আমার হাত সুড়্‌সুড়্ করছে। আমায় দেন।

ঔরংজীব। কিন্তু তাঁকে মার্জনা করেছি।

শায়েস্তা। সে কী জাঁহাপনা—এমন শত্রুকে মার্জনা আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী।

ঔরংজীব। তা জানি। তার জন্যই তো তাঁকে মার্জনা করার পরম গৌরব অনুভব করছি।

শায়েস্তা। জাঁহাপনা! এ গৌরব ক্রয় করতে আপনার সিংহাসনখানি বিক্রয় করতে হবে।

ঔরংজীব। যে বাহুবলে এ সিংহাসন অধিকার করেছি, সেই বাহুবলেই তা রক্ষা করতে হবে।

শায়েস্তা। জাঁহাপনা! একটা মহাবিপদকে ঘাড়ে করে সমস্ত জীবন রাজ্যশাসন করতে হবে! জানেন সমস্ত প্রজা, সৈন্য, দারার দিকে? সেদিন দারার জন্য তারা বালকের মতো কেঁদেছে; আর জাঁহাপনাকে অভিশাপ দিয়েছে। তারা যদি একবার সুযোগ পায়—

ঔরংজীব। কী রকমে?

শায়েস্তা। জাঁহাপনা দারাকে অষ্টপ্রহর পাহারা দিতে পারবেন না। জাঁহাপনা সফরে গেলে সৈন্যগণ যদি কোনোদিন কোনো সুযোগে দারাকে মুক্ত করে দেয়—তা হলে জাঁহাপনা—বুঝছেন?

ঔরংজীব। বুঝছি।

শায়েস্তা। তার উপর বৃদ্ধ সম্রাটও দারার পক্ষে। আর তাঁকে সৈন্যেরা মানে তাদের গুরুর মতো, ভালোবাসে পিতার মতো।

ঔরংজীব। হুঁ, [পরিক্রমণ] নাহয় সিংহাসন দেব।

শায়েস্তা। তবে এত শ্রম করে তা অধিকার করার প্রয়োজন কী ছিল? পিতাকে সিংহাসনচ্যুত, ভ্রাতাকে বন্দি—বড় বেশিদূর এগিয়েছেন জাঁহাপনা।

ঔরংজীব। কিন্তু—

জিহন। খোদাবন্দ! দারা কাফের! কাফেরকে ক্ষমা করবেন আপনি খোদাবন্দ! এই ইসলামধর্মের রক্ষার জন্য আপনি আজ ঐ সিংহাসনে বসেছেন—মনে রাখবেন। ধর্মের মর্যাদা রাখবেন।

ঔরংজীব। সত্যকথা জিহন খাঁ! আমি নিজের প্রতি সব অন্যায় অবিচার ঘাড় পেতে নিতে পারি; কিন্তু ইসলামধর্মের প্রতি অবমাননা সইব না। শপথ করেছি—হাঁ, দারার মৃত্যুই তার যোগ্য দণ্ড। জিহন আলি খাঁ, নেও মৃত্যুদণ্ড!—রোসো দস্তখত করে দিই। [দস্তখত]

জিহন। দিউন জাঁহাপনা! আজ রাত্রেই দারার ছিন্নমুণ্ড জাঁহাপনাকে এনে দেখাব—বাহিরে আমার অশ্ব প্রস্তুত।

ঔরংজীব। আজই!

শায়েস্তা। [মৃত্যুদণ্ড ঔরংজীবের হস্ত হইতে লইয়া] আপদ যত শীঘ্র যায় তত ভালো।

জিহনকে দণ্ডাজ্ঞা দিলেন

জিহন। বন্দেগি জাঁহাপনা।

প্রস্থানোদ্যত

ঔরংজীব। রোসো দেখি। [দণ্ডাজ্ঞা গ্রহণ, পাঠ ও প্রত্যর্পণ] আচ্ছা যাও।

জিহন গমনোদ্যত হইলে, ঔরংজীব আবার
তাহাকে ডাকিলেন

ঔরংজীব। রোসো দেখি! [দণ্ডাজ্ঞা পুনরায় গ্রহণ ও পুনরায় প্রত্যর্পণ] আচ্ছা—যাও।

[জিহন আলির প্রস্থান]

ঔরংজীব। [আবার জিহনের দিকে গেলেন; আবার ফিরিলেন, তার পরে ক্ষণেক ভাবিলেন; পরে কহিলেন] না কাজ নেই!—জিহন আলি! জিহন আলি! না চলে গেছে।—শায়েস্তা খাঁ!

শায়েস্তা। খোদাবন্দ!

ঔরংজীব। কী করলাম!

শায়েস্তা। জাঁহাপনা বুদ্ধিমানের কার্যই করেছেন।

ঔরংজীব। কিন্তু যাক—

[ধীরে ধীরে প্রস্থান]

শায়েস্তা। ঔরংজীব! তবে তোমারও বিবেক আছে?

[প্রস্থান]

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—খিজিরাবাদের কুটির। কাল—রাত্রি।

সিপার একটি শয্যার উপরে নিদ্রিত, দারা একাকী জাগিয়া তাহার পানে চাহিয়া ছিলেন ।

দারা। ঘুমাচ্ছে—সিপার ঘুমাচ্ছে। নিদ্রা! সর্বসন্তাপহারিণী নিদ্রা! আমার সিপারকে সর্বদুঃখ ভুলিয়ে রেখো—বৎস প্রবাসে আমার সঙ্গে হিমে উত্তাপে বড় কষ্ট পেয়েছে, তাকে তোমার যথাসাধ্য সান্ত্বনা দাও। আমি অক্ষম। সন্তানকে রক্ষা করা, খাদ্য দেওয়া, বস্ত্র দেওয়া—পিতার কাজ! তা আমি পারিনি—বৎস! তুই ক্ষুধায় অবশ হয়েছিস, আমি খাদ্য দিতে পারিনি। শীতে গাত্রবস্ত্র দিতে পারিনি—আমি নিজে খেতে পাইনি, শুতে পাইনি—সে দুঃখ আমার বক্ষে সেরকম কখনো বাজেনি বৎস, যেমন তোর দুঃখ তোর দৈন্য অবমাননা আমার বক্ষে বেজেছে! বৎস! প্রাণাধিক আমার, তোর পানে আজ চেয়ে দেখছি, আর আমার মনে হচ্ছে আজ-যে সংসারে আর কেউ নেই—কেবল তুই আর আমি আছি। আমার এত দুঃখ, আজ আমি কারাগারে বন্দি, তবু তোর মুখখানির পানে চাইলে সব দুঃখ ভুলে যাই।

দিলদারের প্রবেশ

দারা। কে তুমি?

দিলদার। আমি—এ কী দৃশ্য!

দারা। কে তুমি?

দিলদার। আমি ছিলাম পূর্বে সুলতান মোরাদের বিদূষক। এখন আমি সম্রাট ঔরংজীবের সভাসদ।

দারা। এখানে কী প্রয়োজন?

দিলদার। প্রয়োজন কিছুই নাই। একবার দেখা করতে এসেছি।

দারা। কেন যুবক? আমাকে ব্যঙ্গ করতে? করো।

দিলদার। না যুবরাজ! আমি ব্যঙ্গ করতে আসিনি। আর যদিই ব্যঙ্গ করতে আসতাম তো, এ দৃশ্য দেখে সে ব্যঙ্গ গলে অশ্রু হয়ে টস টস করে মাটিতে পড়ত—এই দৃশ্য! সেই যুবরাজ দারা আজ এই! [ভগ্নস্বরে] ভগবান!

দারা। এ কী যুবক! তোমার চোখ দিয়ে জল পড়ছে যে—কাঁদছ! কাঁদো!

দিলদার। না কাঁদব না! এ বড় মহিমময় দৃশ্য!—একটা পর্বত ভেঙে পড়ে রয়েছে, একটা সমুদ্র শুকিয়ে গিয়েছে; একটা সূর্য মলিন হয়ে গিয়েছে! ব্রহ্মাণ্ডের একদিকে সৃষ্টি আর-একদিকে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। সংসারেও তাই। এ একটা ধ্বংস—বিরাট, পবিত্র, মহিমময়!

দারা। তুমি একজন দার্শনিক দেখছি যুবক!

দিলদার। না যুবরাজ, আমি দার্শনিক নই, আমি বিদূষক, পারিষদপদে উঠেছি, দার্শনিকপদে এখনও উঠিনি। তবে ঘাস খেতে খেতে মাঝে মাঝে এক-একবার মুখ তুলে চাওয়ার নাম যদি দর্শন হয়, তা হলে আমি দার্শনিক! শাহাজাদা মূর্খ ভাবে যে প্রদীপ জ্বলাই স্বাভাবিক, প্রদীপ নেভা অন্যায়; যে গাছ গজিয়ে ওঠাই উচিত, মরে যাওয়া উচিত নয়; যে মানুষের সুখটি ঈশ্বরের কাছে প্রাপ্য, দুঃখই তার অত্যাচার; কিন্তু তারা একই নিয়মের দুইটি দিক!

দারা। যুবক আমি তা ভাবি না—তবু—দুঃখে হাসতে পারে কে? মরতে চায় কে? আমি মরতে চাই না!

দিলদার। যুবরাজ! আপনার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা আমি আজ রহিত করে এসেছি। আপনি কারাগার হতে মুক্ত হতে চান যদি, আসুন তবে। আমার বস্ত্র পরিধান করুন—চলে যান। কেউ সন্দেহ করবে না। আসুন, দুজনে বেশ পরিবর্তন করি।

দারা। তারপরে তুমি!

দিলদার। আমি মরতে চাই। মরতে আমার বড় আনন্দ! এ সংসারে কেউ নেই যে আমার জন্য শোক করবে!

দারা। তুমি মরতে চাও!!!

দিলদার। হাঁ, আমি মরবার একটা সুযোগ খুঁজছিলাম শাহাজাদা। মরতে আমি বড় ভালোবাসি। আপনার কাছে যে আজ কী কৃতজ্ঞ হলাম তা আর কী বলব।

দারা। কেন?

দিলদার। মরবার একটা সুযোগ দেওয়ার জন্য। আসুন।

দারা। দয়াময়! এই-ই স্বর্গ! আবার কী!—না যুবক! আমি যাব না।

দিলদার। কেন? মরবার এমন সুযোগও ভিক্ষা করে পাব না, শাহাজাদা!

পদধারণ

দারা। আমি তোমায় মরতে দিতে পারি না। আর বিশেষত এই বালককে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।

জিহন খাঁর প্রবেশ

জিহন। আর কোথাও যেতে হবে না। এই দারার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা।

দিলদার। সে কী!

জিহন। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হউন শাহাজাদা। ঘাতক উপস্থিত।

দিলদার। তবে সম্রাট মত বদলেছেন?

জিহন। হাঁ দিলদার। তুমি এখন অনুগ্রহ করে বাহিরে যাও। আমাদের কার্য—আমরা করি!

দারা। ঔরংজীব তার প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যে নিশ্বাস ফেলবার জন্য আমাকে আধকাঠা জমিও দিতে পারে না? আমি এই অধম কুঁড়েঘরে আছি, গায়ে এই ছেঁড়া ময়লা কাপড়, খাদ্য খানদুই পোড়া রুটি। তাও সে দিতে পারে না?

দিলদার। তুমি একটু অপেক্ষা করো জিহন আলি! আমি সম্রাটের আদেশ নিয়ে আসি।

জিহন। না দিলদার! সম্রাটের এই আজ্ঞা যে, আজই রাত্রিকালে শাহাজাদার ছিন্নমুণ্ড তাঁকে গিয়ে দেখাতে হবে।

দারা। আজই রাত্রে! এত শীঘ্র! এ মুণ্ড তার চাই-ই! নইলে তার নিদ্রায় ব্যাঘাত হচ্ছে। —এ মুণ্ডের এত দাম আগে জানতাম না।

জিহন। আজই রাত্রে আপনার মুণ্ড না নিয়ে যেতে পারলে আমাদের প্রাণ যাবে।

দারা। ওহ্! তবে আর তুমি কী করবে জিহন খাঁ। উত্তম! তবে আমায় বধ করো! যখন সম্রাটের আজ্ঞা।—আজ কে সম্রাট, কে প্রজা!—হাসছ? —হাসো।

জিহন। আপনি প্রস্তুত?

দারা। প্রস্তুত বৈ কি! আর প্রস্তুত না হলেই বা তোমাদের কী যায় আসে। [দিলদারকে] একদিন এই জিহন আলি খাঁ-ই আমার কাছে করজোড়ে প্রাণভিক্ষা চেয়েছিল। আমি তা দিয়েছিলাম। আজ—বিধি!—তোমার রচনা-কৌশল—চমৎকার!

জিহন। সম্রাটের আজ্ঞা! কাজির বিচার! আমি কী করব শাহাজাদা?

দারা। সম্রাটের আজ্ঞা! কাজির বিচার! তা বটে! তুমি কী করবে! যাও বন্ধু! তোমার সঙ্গে আমার এই প্রথম আর এই শেষ দেখা।

দিলদার। পারছি না। রক্ষা করতে পারলাম না যুবরাজ। তবে এই বুঝি দয়াময়ের ইচ্ছা! বুঝতে পারছি না; কিন্তু বুঝি, এর একটা মহৎ উদ্দেশ্য আছে, এর একটা মহৎ পরিণাম আছে। নইলে এতখানি নির্মমতা এতখানি পাপ কি বৃথাই যাবে? জেনো যুবরাজ। তোমার মতো বলির একটা প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। কী সে প্রয়োজন আমিতো বুঝছি না; কিন্তু আছেই সে প্রয়োজন! হৃষ্টমনে প্রাণ বলি দাও।

দারা। নিশ্চয়ই, কিসের দুঃখ! একদিন তো যেতে হবেই! তবে দুদিন আগে দুদিন পিছে! আমি প্রস্তুত। আমায় বিদায় দাও বন্ধু! তোমার সঙ্গে এই ক্ষণমাত্রের দেখা; তুমি কে তা জানি না, তবু বোধ হচ্ছে যেন তুমি বহুদিনের পুরাতন বন্ধু।

দিলদার। তবে যান যুবরাজ! এখানে আমাদের শেষ দেখা।

[প্রস্থান]

দারা। এখন আমায় বধ করো—জিহন আলি।

জিহন। নাজির!

দুইজন ঘাতকের প্রবেশ

জিহন সঙ্কেত করিল

দারা। একটু রোসো। একবার—সিপার। সিপার!—না! কেন ডাকলাম!

সিপার। [উঠিয়া] বাবা!—এ কী! এরা কারা বাবা!—আমার ভয় করছে।

দারা। এরা আমায় বধ করতে এসেছে। তোমার কাছে বিদায় নেবার জন্য তোমাকে জাগিয়েছি। আমাকে বিদায় দাও বৎস! [আলিঙ্গন] এখন যাও। জিহন খাঁ, তুমি বোধহয় এতবড় পিশাচ নও যে আমার পুত্রের সম্মুখে আমায় বধ করবে! একে অন্য ঘরে নিয়ে যাও।

জিহন। [একজন ঘাতককে] একে ঐ ঘরে নিয়ে যাও।

সিপার। [একজন ঘাতকের দ্বারা ধৃত হইয়া] না, আমি যাব না। আমার বাবাকে বধ করবে! কেন বধ করবে! [ঘাতকের হাত ছাড়াইয়া আসিল] বাবা—আমি তোমায় ছেড়ে যাব না।

এই বলিয়া সিপার সজোরে দারার পা জড়াইয়া ধরিল

দারা। আমায় জড়িয়ে ধরে কী করবে বৎস! আঁকড়ে ধরে কি আমাকে রক্ষা করতে পারবে? যাও বৎস! এরা আমায় বধ করবে। তুমি সে-দৃশ্য দেখতে পারবে না।

ঘাতকদ্বয় চক্ষু মুছিতে লাগিল

জিহন। নিয়ে যাও।

ঘাতক পুর্নবার সিপারকে হেঁচড়াইয়া লইয়া যাইতে আসিল

সিপার। [চিৎকার করিয়া] না,আমি যাব না। আমি যাব না।

দারা। দাঁড়াও। আমি ওকে বুঝিয়ে বলছি। তারপরে ও আর-কোনো আপত্তি করবে না—ছেড়ে দাও।

ঘাতক তাহাকে ছাড়িয়া দিল। সিপার দারার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

দারা। [সিপারের হাত ধরিয়া] সিপার!

সিপার। বাবা!

দারা। সিপার—প্রিয়তম বৎস আমার! আমাকে বিদায় দে। তুই এতদিন এত দুঃখেও আমাকে ছাড়িসনি—হিমে, রৌদ্রে, অনশনে, অনিদ্রায় আমার সঙ্গে অরণ্যে, মরুভূমে বেড়িয়েছিস—তবু আমাকে ছাড়িসনি। আমি যন্ত্রণায় অন্ধ হয়ে তোর বুকে ছুরি মারতে গিয়েছিলাম, তবু আমায় ছাড়িসনি। আমায় প্রবাসে, যুদ্ধে, কারাগারে, প্রাণের মতো বুকের মধ্যে শোণিতের সঙ্গে মিশে ছিলি, আমায় ছাড়িসনি। আজ তোর নিষ্ঠুর পিতা—[বলিতে বলিতে দারার স্বর ভাঙিয়া গেল। তাহার পরে বহুকষ্টে আত্মদমন করিয়া দারা কহিলেন]—তোর নিষ্ঠুর পিতা আজ তোকে ছেড়ে যাচ্ছে।

সিপার। বাবা! মা গিয়েছেন—তুমিও—

ক্রন্দন

দারা। কী করব! উপায় নাই বৎস! আমায় আজ মরতে হবে। আমার দেহ ছেড়ে যেতে আজ আমার তত কষ্ট হচ্ছে না বৎস, তোকে ছেড়ে যেতে আজ আমার যে কষ্ট হচ্ছে। [চক্ষু মুছিলেন] যাও বৎস! এরা আমাকে বধ করবে। সে বড় ভীষণ দৃশ্য। সে দৃশ্য তুমি দেখতে পারবে না!

সিপার। বাবা! আমি তোমাকে ছেড়ে যাব না—আমি যাব না!

দারা। সিপার! কখনও তুমি আমার কথার অবাধ্য হওনি! কখনও তো—[চক্ষু মুছিলেন] যাও বৎস! আমার শেষ আজ্ঞা—আমার এই শেষ অনুরোধ রাখো। যাও—আমার কথা শুনবে না? সিপার, বৎস! যাও।

সিপার নতমুখ চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে দারা ডাকিলেন—'সিপার!'

সিপার ফিরিল

দারা। একবার—শেষবার বুকে ধরে নেই। [বক্ষে আলিঙ্গন] ওহ্—এখন যাও বৎস!

সিপার মন্ত্রমুগ্ধবৎ নতমুখে একজন ঘাতকের সহিত কক্ষান্তরে চলিয়া গেল

দারা। [ঊর্ধ্বমুখে বক্ষে হাত দিয়া] ঈশ্বর! পূর্বজন্মে কী মহাপাপ করেছিলাম! ওহ্ যাক, হয়ে গিয়েছে। নাজির তোমার কার্য করো।

জিহন। ঐ ঘরে নিয়ে গিয়ে কাজ শেষ করে নিয়ে এসো, এখানে দরকার নাই। [ঘাতকদ্বয়ের সহিত দারা প্রস্থান করিলেন]

জিহন। আমার প্রাণদাতার হত্যাটা সম্মুখে নাই দেখলাম।—ঐ কুঠারের শব্দ—ঐ মৃত্যুর আর্তনাদ।

[নেপথ্যে। ও! ও! ও!]

জিহন। যাক সব শেষ!

সিপার। [কক্ষান্তর হইতে] বাবা! বাবা! [দরজা ভাঙিতে চেষ্টা করিতে লাগিল]

ঘাতক দারার ছিন্নমুণ্ড লইয়া পুনঃপ্রবেশ করিল

জিহন। দাও, মুণ্ড আমায় দাও। আমি সম্রাটের কাছে নিয়ে যাব।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—দিল্লির দরবারগৃহ। কাল—প্রাহ্ন।

ময়ূর সিংহাসনে ঔরংজীব। সম্মুখে মীরজুমলা, শায়েস্তা খাঁ, যশোবন্ত সিংহ, জয়সিংহ, দিলীর খাঁ ইত্যাদি।

ঔরংজীব। আমি প্রতিজ্ঞামতো মহারাজকে গুর্জর প্রদেশ দিয়েছি।

যশোবন্ত। তার বিনিময়ে জাঁহাপনাকে আমি আমার সেনাসাহায্য স্বেচ্ছায় দিতে এসেছি।

ঔরংজীব। মহারাজ যশোবন্ত সিংহ! ঔরংজীব দুবার কাউকে বিশ্বাস করে না। তথাপি আমরা মহারাজ জয়সিংহের খাতিরে মাড়বার-রাজকে সম্রাটের রাজভক্ত প্রজা হবার দ্বিতীয় সুযোগ দিব।

জয়সিংহ। জাঁহাপনার অনুগ্রহ।

যশোবন্ত। জাঁহাপনা। আমি বুঝেছি; যেভাবেই হোক বা শক্তিবলেই হোক, জাঁহাপনা! যখন সিংহাসন অধিকার করে সাম্রাজ্যে একটা শান্তিস্থাপন করেছেন, তখন কোনোরূপে সে শান্তিভঙ্গ করতে যাওয়া পাপ।

ঔরংজীব। আমি এ-কথা মহারাজের মুখে শুনে সুখী হলাম। মহারাজকে এখন তবে আমাদের বন্ধুবর্গের মধ্যে গণ্য করতে পারি বোধ হয়?

যশোবন্ত। নিশ্চয়।

ঔরংজীব। উত্তম মহারাজ! উজিরসাহেব। সুলতান সুজা এখন আরাকানরাজার আশ্রয়ে?

মীরজুমলা। গোলাম তাঁকে আরাকানের সীমা পর্যন্ত প্রতাড়িত করে রেখে এসেছে।

ঔরংজীব। উজিরসাহেব, আমরা আপনার বাহুবলের প্রশংসা করি।—সেনাপতি! কুমার মহম্মদকে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দি করে রেখে এসেছেন?

শায়েস্তা। খোদাবন্দ।

ঔরংজীব। বেচারি পুত্র! কিন্তু জহরৎ জানুক যে আমাদের কাছে এক নীতি। পুত্র মিত্র বিচার নাই।

জয়সিংহ। নিঃসন্দেহে জাঁহাপনা।

ঔরংজীব। হতভাগ্য দারার মৃত্যু আমাদের সমস্ত জয়কে ম্লান করে দিয়েছে; কিন্তু ভাই, পুত্র যাউক, ধর্ম প্রবল হউক।—ভাই মোরাদ গোয়ালিয়র দুর্গে কুশলে আছেন, সেনাপতি?

শায়েস্তা। খোদাবন্দ!

ঔরংজীব। মূঢ় ভাই! নিজের দোষে সাম্রাজ্য হারালে! আর আমি মক্কাযাত্রার মহাসুখে বঞ্চিত হলাম।—খোদার ইচ্ছা। দিলীর খাঁ! আপনি কুমার সোলেমানকে কী রকমে বন্দি করলেন?

দিলীর। জাঁহাপনা! শ্রীনগরের রাজা পৃথ্বীসিংহ কুমারকে সসৈন্যে আশ্রয় দিতে অস্বীকৃত হন। তাতে কুমার আমাদের পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। আমি তারপরেই জাঁহাপনার পত্র পেয়ে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জাঁহাপনার আদেশ মতো বললাম যে, 'কুমার সম্রাটের ভ্রাতুষ্পুত্র, সম্রাট তাঁকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন, তাঁকে সম্রাটের হস্তে সমর্পণ করায় ক্ষাত্রধর্মের অন্যথা হবে না।' শ্রীনগরের রাজা প্রথমে কুমারকে আমার হস্তে অর্পণ করতে অস্বীকৃত হলেন। পরদিনই তিনি কুমারকে রাজ্য থেকে বিদায় দিলেন। কারণ বুঝলাম না।

ঔরংজীব। অভাগা কুমার! তার পর!

দিলীর। কুমার তিব্বত যাবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন; কিন্তু পথ না-জানার দরুন সমস্ত রাত্রি ঘুরে প্রভাতে আবার শ্রীনগরের প্রান্তে এসে উপস্থিত হন; তারপর আমি সসৈন্যে গিয়ে—তাঁকে বন্দি করি—এতে আমার যদি কোনো অপরাধ হয়ে থাকে, খোদা আমায় রক্ষা করুন! আমি ব্যক্তিবিশেষের ভৃত্য নহি। আমি সম্রাটের সৈন্যাধ্যক্ষ। সম্রাটের আজ্ঞাপালন করতে আমি বাধ্য!

ঔরংজীব। তাকে এখানে নিয়ে আসুন খাঁ সাহেব!

দিলীর। যে আজ্ঞে!

[প্রস্থান]

ঔরংজীব। জিহন আলি খাঁকে নাগরিকগণ হত্যা করেছে মহারাজ?

জয়সিংহ। হাঁ খোদাবন্দ! শুনলাম জিহন খাঁরই প্রজারা তাঁকে হত্যা করেছে!

ঔরংজীব। পাপাত্মার সমুচিত দণ্ড খোদা দিয়েছেন!—এই যে কুমার!

সোলেমান সমভিব্যাহারে দিলীর খাঁর প্রবেশ

এই যে কুমার!—কুমার সোলেমান!—কি কুমার! শির নত করে রয়েছ যে?

সোলেমান। সম্রাট—[বলিতে বলিতে স্তব্ধ হইলেন]

ঔরংজীব। বলো, কী বলছিলে বলো বৎস।—তোমার কোনো ভয় নাই। তোমার পিতার মৃত্যুর আবশ্যক হয়েছিল। নহিলে—

সোলেমান। জাঁহাপনা, আমি আপনার কৈফিয়ৎ চাহি নাই। আর দিগ্বিজয়ী ঔরংজীবের আর কারো কাছে কৈফিয়ৎ দেবারও প্রয়োজন নাই। কে বিচার করবে! আমাকে বধ করুন। জাঁহাপনার ছুরিতে যথেষ্ট ধার আছে, তাতে বিষ মেশানোর প্রয়োজন কী!

ঔরংজীব। সোলেমান! আমরা তোমাকে বধ করব না। তবে—

সোলেমান। ও 'তবে'র অর্থ জানি সম্রাট। মৃত্যুর চেয়ে ভীষণ একটা-কিছু করতে চান। সম্রাটের মনে যদি একটা নিষ্ঠুর কার্য করবার প্রবৃত্তি জাগে, তো

শত্রুর তার বাড়া আর কোনো ভয় নেই; কিন্তু যদি দুটো নিষ্ঠুর কার্য তার মনে পড়ে, তবে যেটি বেশি নিষ্ঠুর সেইটেই ঔরংজীব করবে তা জানি। তাঁর প্রতিহিংসার চেয়ে তাঁর দয়া ভয়ঙ্কর। আদেশ করুন সম্রাট—তবে—

ঔরংজীব। ক্ষুব্ধ হয়ো না কুমার।

সোলেমান। না! আর কেন—ওহ্। মানুষ এমন মৃদু কথা করতে পারে, আর এতবড় দুরাত্মা হতে পারে!

ঔরংজীব। সোলেমান, তোমায় আমরা পীড়ন করতে চাই না। তোমার কোনো ইচ্ছা থাকে যদি তো বলো। আমি অনুগ্রহ করব।

সোলেমান। আমার এক ইচ্ছা যে জাঁহাপনা, আমাকে যথাসাধ্য পীড়ন করুন। আমার পিতৃহন্তার কাছে আমি করুণার এককণাও চাই না। সম্রাট! মনে করে দেখুন দেখি যে কী করেছেন? নিজের ভাইকে—একই মায়ের গর্ভের সন্তান, একই পিতার স্নেহসিক্ত নয়নের তলে লালিত, শিরায় একই রক্ত—যার চেয়ে সংসারে আপন আর কেউ নেই—সেই ভাইকে আপনি হত্যা করেছেন। যে শৈশবে ক্রীড়ার সঙ্গী, যৌবনে স্নেহময় সহপাঠী; যার প্রতি কেউ রোষকটাক্ষ করলে সে কটাক্ষ নিজের বক্ষে বজ্রসম বাজা উচিত; যাকে আঘাত থেকে রক্ষা করবার জন্য নিজের বুক এগিয়ে দেওয়া উচিত; তাকে—তাকে আপনি হত্যা করেছেন। আর এ এমন ভাই! আপনি চাইলে এ সাম্রাজ্য আপনাকে যিনি একমুঠো ধূলার মতো ফেলে দিতে পারতেন, যিনি আপনার কোনো অনিষ্ট করেননি, যাঁর একমাত্র অপরাধ যে তিনি সর্বজনপ্রিয়—এমন ভাইকে আপনি হত্যা করেছেন। পরকালে যখন তাঁর সঙ্গে দেখা হবে, তাঁর মুখপানে চাইতে পারবেন?—হিংস্র! পিশাচ! শয়তান!—তোমার অনুগ্রহে আমি পদাঘাত করি!

ঔরংজীব। তবে তাই হোক। আমি তবে তোমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলাম!—নিয়ে যাও [অবতরণ] আল্লার নাম করো সোলেমান।

বালকবেশিনী জহরৎ উন্নিসার প্রবেশ

জহরৎ। আল্লার নাম করো ঔরংজীব।

সোলেমান তাহার হাত ধরিলেন

সোলেমান। এ কে? জহরৎ উন্নিসা!

জহরৎ। ছেড়ে দাও। কে তুমি? পাপাত্মাকে আমি বধ করব। ছেড়ে দাও—দাও!!

সোলেমান। সে কী জহরৎ! ক্ষান্ত হও—হত্যার প্রতিশোধ হত্যা নয়। পাপে পুণ্যের প্রতিষ্ঠা হয় না। আমি পারতাম তো সম্মুখযুদ্ধে এর শির নিতাম; কিন্তু হত্যা—মহাপাপ।

জহরৎ। ভীরু সব! পিতার কুলাঙ্গার পুত্রগণ! চলে যাও! আমি আমার পিতার বধের প্রতিশোধ নেব! ছেড়ে দাও, ঐ—ভণ্ড, দস্যু, ঘাতক—

মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন

ঔরংজীব। মহৎ উদার যুবক!—যাও, তোমায় আমি বধ করব না! শায়েস্তা খাঁ, একে গোয়ালিয়র দুর্গে নিয়ে যাও।—আর দারার কন্যাকে আমার পিতার নিকটে আগ্রার প্রাসাদদুর্গে নিয়ে যাও।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—আরাকান রাজপ্রাসাদ। কাল—রাত্রি।

সুজা ও পিয়ারা

সুজা। নিয়তি আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে এসে শেষে যে এই বন্য আরাকানের রাজার আশ্রয়ে এনে ফেলবে তা কে জানত!

পিয়ারা। আবার কোথায় যে নিয়ে যাবে তাই বা কে জানে?

সুজা। বন্য রাজা কী রটিয়েছে জানো?

পিয়ারা। কী! খুব জাঁকালো রকম কিছু-একটা নিশ্চয়। শীঘ্র বলো কী রটিয়েছে? শুনবার জন্য হাঁপিয়ে মরে যাচ্ছি!

সুজা। বর্বর রটিয়েছে যে আমি চল্লিশজন অশ্বারোহী নিয়ে এসেছি—আরাকান জয় করতে। খিলিজি সতেরোজন অশ্বারোহী নিয়ে বাঙ্গালাদেশ জয় করেছিলেন।

সুজা। অসম্ভব। ওটা কেউ বিদ্বেষবশে রটিয়েছে নিশ্চয়। আমি বিশ্বাস করি না।

পিয়ারা। তাতে ভারি যায় আসে।

সুজা। পিয়ারা! রাজা কী আজ্ঞা দিয়েছে জানো? রাজা আমাদের কাল প্রভাতে এখান থেকে চলে যেতে আজ্ঞা দিয়েছে!

পিয়ারা। কোথায়? নিশ্চয় তিনি আমাদের খুব-একটা ভালো স্বাস্থ্যকর জায়গার বন্দোবস্ত করেছেন।

সুজা। পিয়ারা, তুমি কী কঠিন, ঘটনার রাজ্যে একবার ভুলেও এসে নামবে না! এতেও পরিহাস!

পিয়ারা। এতে পরিহাস করতে নেই বুঝি? আগে বলতে হয়। আচ্ছা, এই নেও গম্ভীর হচ্ছি।

সুজা। হাঁ গম্ভীর হয়ে শোনো! আর-এক কথা শুনবে? শোনো যদি, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসবে, ক্রোধে কণ্ঠরোধ হবে, সর্বাঙ্গে আগুন ছুটবে।

পিয়ারা। ও বাবা।

সুজা। তবে বলি শোনো!—দুরাত্মা আমাদের আশ্রয়দানের মূল্যস্বরূপ কী চায় জানো? সে তোমাকে চায়!—কি, স্তব্ধ হয়ে রইলে যে, করো পরিহাস।

পিয়ারা। নিশ্চয়। আমার রাজার প্রতি ভক্তি বেড়ে গেল। এই রাজা সমজদার বটে।

সুজা। পিয়ারা! ওরকম কোরো না। আমি খেপে যাব। এটা তোমার কাছে পরিহাস হতে পারে, কিন্তু এ আমার কাছে মর্মশেল।—পিয়ারা! তুমি আমার কে তা জানো?

পিয়ারা। স্ত্রী বোধহয়!

সুজা। না। তুমি আমার রাজ্য, সম্পদ, সর্বস্ব—ইহকাল পরকাল! আমি রাজ্য হারিয়েছি—কিন্তু এতদিন তার অভাব অনুভব করিনি—আজ করলাম।

পিয়ারা। কেন?

সুজা। যা আমার কাছে জীবন-মরণের কথা, তাই নিয়ে তুমি পরিহাস করছ!

পিয়ারা। না, এ বড় বাড়াবাড়ি; দোজপক্ষে অনেকে বিয়ে করে; কিন্তু তোমার মতো কেউ উচ্ছন্ন যায়নি।

সুজা। না। আমি বুঝেছি! তুমি শুধু মুখে পরিহাস করছ; কিন্তু অন্তরে অন্তরে গুমরে মরে যাচ্ছ! তোমার মুখে হাসি, চোখে জল।

পিয়ারা। ধরেছ! না! কে বললে আমার চোখে জল। এই নাও, [চক্ষু মুছিলেন] আর নেই।

সুজা। এখন কী করবে ভেবেছ?

পিয়ারা। আমায় বেচে দাও।

সুজা। পিয়ারা! যদি আমায় ভালোবাসো তো ও-মারাত্মক পরিহাস রেখে দাও। শোনো—আমি কী করব জানো?

পিয়ারা। না।

সুজা। আমিও জানি না! ঔরংজীবের দ্বারস্থ হব?—না। তার চেয়ে মৃত্যু ভালো। কি! কথা কচ্ছ না যে পিয়ারা!

পিয়ারা। ভাবছি!

সুজা। ভাবো।

পিয়ারা। [ক্ষণেক ভাবিয়া] কিন্তু পুত্র কন্যারা?

সুজা। কী?

পিয়ারা। কিছু না।

সুজা। আমি কী করব জানো?

পিয়ারা। না।

সুজা। বুঝতে পারছি না! আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা হয়—তবে তোমাকে ছেড়ে যেতে পারি না।

পিয়ারা। আর আমি যদি সঙ্গে যাই?

সুজা। সুখে মরতে পারি।—না, আমার জন্য তুমি মরতে যাবে কেন!

পিয়ারা। তা তাই হোক!—কাল প্রভাতে আমাদের নির্বাসন নয়। কাল যুদ্ধ হবে। এই চল্লিশজন অশ্বারোহী নিয়েই এই রাজ্য আক্রমণ করো; করে বীরের মতো মরো। আমি তোমার পাশে দাঁড়িয়ে মরব। আর পুত্র কন্যারা—তারা নিজের মর্যাদা নিজে রক্ষা করবে আশা করি।—কি বলো?

সুজা। বেশ; কিন্তু তাতে কী লাভ হবে?

পিয়ারা। তদ্ভিন্ন উপায় কী! তুমি মরে গেলে আমাকে কে রক্ষা করবে! আর তুমি এতদিন বীরের মতো জীবন ধারণ করেছ, বীরের মতো মরো! এই বন্য রাজাকে এই ঘৃণ্য প্রস্তাব করার যোগ্য প্রতিফল দাও।

সুজা। সেই ভালো। কাল তবে দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে মরব।

পিয়ারা। তবে আমাদের ইহজীবনের এই শেষ মিলনরাত্রি?

সুজা। আজ তবে হাসো, কথা কও, গাও—যা দিয়ে আমাকে এতদিন ছেয়ে দিতে, ঘিরে বসে থাকতে! একবার শেষবার দেখে নেই, শুনে নেই। তোমার বীণাটি পাড়ো! গাও—স্বর্গ মর্তে নেমে আসুক! ঝঙ্কারে আকাশ ছেয়ে দাও। তোমার সৌন্দর্যে একবার এ অন্ধকারকে ধাঁধিয়ে দাও। তোমার প্রেমে আমাকে আবৃত করে দাও। রোসো, আমি আমার অশ্বারোহীদের বলে আসি। আজ সারা রাত্রি ঘুমাব না।

[প্রস্থান]

পিয়ারা। মৃত্যু! তাই হোক! মৃত্যু—যেখানে সব ঐহিক আশার শেষ, সুখদুঃখের সমাধি; মৃত্যু—যে গাঢ় নিদ্রা আর এখানে জাগে না, যে অন্ধকার এখানে আর প্রভাত হয় না; যে স্তব্ধতা এখানে আর ভাঙে না। মৃত্যু—মন্দ কী! একদিন তো আছেই। তবে দিন থাকতে মরা ভালো। আজ তবে এই রূপ নির্বাণোন্মুখ শিখার মতো উজ্জ্বলতম প্রভায় জ্বলে উঠুক, এই গান তারস্বরে আকাশে উঠে নক্ষত্ররাজ্য লুটে নিক; আজিকার সুখ বিপদের মতো কেঁপে উঠুক, আনন্দ দুঃখের মতো কেঁপে উঠুক, সমস্ত জীবন একটি চুম্বনে মরে যাক! আজ আমাদের শেষ মিলন-রাত্রি।

[প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—আগ্রায় সাজাহানের প্রাসাদ-কক্ষ।
কাল—রাত্রি
বাহিরে ঝটিকা বৃষ্টি বজ্র ও বিদ্যুৎ

সাজাহান ও জহরৎ উন্নিসা

সাজাহান। কার সাধ্য দারাকে হত্যা করে? আমি সম্রাট সাজাহান, আমি স্বয়ং তাকে পাহারা দিচ্ছি! কার সাধ্য!—ঔরংজীব?—তুচ্ছ! আমি যদি চোখ রাঙাই, ঔরংজীব ভয়ে কাঁপবে। আমি যদি বলি ঝড় উঠুক; তো ঝড় ওঠে; যদি বলি যে বাজ পড়ুক, তো বাজ পড়ে।

মেঘগর্জন

জহরৎ। উহ্ কী গর্জন! বাহিরে পঞ্চভূতের যুদ্ধ বেধে গিয়েছে। আর ভিতরে এই অর্ধোন্মাদ পিতামহের মনের মধ্যে সেই যুদ্ধ চলেছে। [মেঘগর্জন] ঐ আবার!

সাজাহান। অস্ত্র নাও, অস্ত্র নাও! অসি, ভল্ল, তীর, কামান নিয়ে ছোটো। তারা আসছে—তারা আসছে।—যুদ্ধ করবে! রণবাদ্য বাজাও! নিশান উড়াও!—ঐ তারা আসছে! দূর হ, রক্তলোলুপ শয়তানের দূত! আমায় চিনিস না! আমি সম্রাট সাজাহান। সরে দাঁড়া!

জহরৎ। ঠাকুর্দা, উত্তেজিত হবেন না! চলুন, আপনাকে শুইয়ে রেখে আসি।

সাজাহান। না! আমি সরে গেলেই তারা দারাকে বধ করবে।—কাছে আসিস না খবরদার!

জহরৎ। ঠাকুর্দা—

সাজাহান। কাছে আসিস না। তোদের নিশ্বাসে বিষ আছে; সে নিশ্বাস বদ্ধ জলার বাতাসের চেয়ে বিষাক্ত, পচা হাড়ের চেয়ে দুর্গন্ধ! আর এক পা এগোস্‌নে বলছি।

জহরৎ। ঠাকুর্দা! রাত্রি গভীর। শোবেন আসুন।

জাহানারার প্রবেশ

জাহানারা। কী করুণ দৃশ্য! পিতৃহারা বালিকা পুত্রহারা বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। অথচ তার নিজের বুকের মধ্যে ধুধু করে আগুন জ্বলে যাচ্ছে। কী করুণ! দেখে যাও ঔরংজীব! তোমার কীর্তি দেখে যাও!

জহরৎ। পিসিমা! তুমি উঠে এলে যে?

জাহানারা। মেঘের গর্জনে ঘুম ভেঙে গেল।—বাবা আবার উন্মাদের মতো বকছেন?

জহরৎ। হাঁ পিসিমা।

জাহানারা। ঔষধ দিয়েছ?

জহরৎ। দিয়েছি; কিন্তু এবারে জ্ঞান হতে বিলম্ব হচ্ছে কেন জানি না।

সাজাহান। কে করলে! কে করলে!

জহরৎ। কী ঠাকুর্দা!

সাজাহান। মেরেছে! মেরেছে! ঐ রক্ত ছুটে বেরোচ্ছে! ঘর ভেসে গেল!—দেখি! [ছুটিয়া গিয়া দারার কল্পিত-রক্তে হস্ত দুখানি মাখিয়া] এখনও গরম—ধোঁয়া উঠছে।

জাহানারা। বাবা! এত রাত্রি হয়েছে, এখনও শোন্‌নি?

সাজাহান। ঔরংজীব! আমার পানে তাকিয়ে হাসছ! হাসছ!—না দুরাত্মা! তোমায় শাস্তি দিব। দাঁড়া ঘাতক! হাত জোড় করে দাঁড়া!— কী! ক্ষমা চাচ্ছিস?—ক্ষমা! ক্ষমা নাই! আমার পুত্র বলে ক্ষমা করব ভেবেছিস? —না! তোকে তুষানলে দগ্ধ করবার আজ্ঞা দিলাম! যাও, নিয়ে যাও।

জাহানারা। বাবা, শোন্‌ গে যান!

জহরৎ। আসুন দাদা আমার!

হাত ধরিলেন

সাজানারা। কি মমতাজ! তুমি ওর হয়ে ক্ষমা চাচ্ছ! না আমি ক্ষমা করব না। বিচার করেছি। দারাকে মেরেছে।

জাহানারা। না বাবা, মারেনি। ঘুমোন গে যান।

সাজাহান। মারেনি? মারেনি—সত্য, মারেনি? তবে এ কী দেখলাম! স্বপ্ন?

জাহানারা। হাঁ বাবা স্বপ্ন।

সাজাহান। তবু ভালো; কিন্তু বড় দুঃস্বপ্ন। যদি সত্য হয়!—কি জহরৎ! কাঁদছিস যে!— তবে এ স্বপ্ন নয়? স্বপ্ন নয়! —ও—হো—হো—হো—হো—!

মেঘগর্জন

জহরৎ। এ কী হচ্ছে বাইরে! আজ রাত্রিই কি পৃথিবীর শেষ রাত্রি!—সব খেপে গিয়েছে; জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মাটি—সব খেপে গিয়েছে! —উহ্ কী ভয়ঙ্কর রাত্রি!

সাজাহান। এ সব কী জাহানারা?

জাহানারা। বাবা! রাত্রি গভীর! ঘুমোন। আপনি তো উন্মাদ নন।

সাজাহান। না, আমি উন্মাদ নই। বুঝতে পেরেছি, বুঝতে পেরেছি!—বাইরে ওসব কী হচ্ছে জাহানারা?

জাহানারা। বাইরে একটা প্রলয় বহে যাচ্ছে। ঐ—শুনুন বাবা—মেঘের গর্জন। ঐ শুনুন—বৃষ্টির শব্দ। ঐ শুনুন বাতাসের হুঙ্কার! মুহুর্মুহু বজ্রধ্বনি হচ্ছে। বৃষ্টি জলপ্রপাতের মতো নেমে আসছে। আর ঝঞ্ঝা সেই বৃষ্টির ধারা মুখে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

সাজাহান। দে বেটারা! খুব দে, খুব দে! পৃথিবী নীরব হয়ে সব সহ্য করবে। ও তোদের জন্ম দিয়েছিল কেন!—ও তোদের বুকে করে মানুষ করেছিল কেন! তোরা বড় হইছিস। আর মানবি কেন!—ওর যেমন কর্ম তেমনি ফল। দে বেটারা। কী করবে ও? রাশি রাশি গৈরিক জ্বালা উদ্গমন করবে? করুক, সে গৈরিক জ্বালা আকাশে উঠে দ্বিগুণ জোরে তারই বুকে এসে লাগবে। সে-সমুদ্রতরঙ্গ তুলে ক্রোধে ফুলে উঠবে! উঠুক, সে-তরঙ্গ তার নিজের বক্ষের উপরেই দীর্ঘশ্বাসে ছড়িয়ে পড়বে; তার অন্তর্নিরুদ্ধ বাষ্পে সে ভূমিকম্পে কেঁপে উঠবে? কিছু ভয় নেই! তাতে সে নিজেই ফেটে যাবে। তোদের কিছু করতে পারবে না—অথর্ব বুড়ি বেটি! ও বেটি কেবল শস্য দিতে পারে, বারি দিতে পারে, পুষ্প দিতে পারে। আর কিছু পারে না। দে, ওর বুকের উপর দিয়ে দলে দলে চষে দিয়ে যা! ও কিছু করতে পারবে না—দে বেটারা!—মা, একবার গর্জে উঠতে পারো মা? প্রলয়ের ডাকে ডেকে, শত সূর্যের প্রভায় জ্বলে উঠে, ফেটে চৌচির হয়ে—মহাশূন্যের মধ্যে দিয়ে একবার ছটকে যেতে পারো মা?—দেখি, ওরা কোথায় থাকে?

দন্তঘর্ষণ

জাহানারা। বাবা! বৃথা এই ক্রোধে কী হবে! শোবেন আসুন।

সাজাহান। সত্য মা—বৃথা! বৃথা! বৃথা!

মেঘগর্জন।

জহরৎ। উহ্! কী রাত্রি পিসিমা! উহ্ কী ভয়ঙ্কর!

সাজাহান। ইচ্ছা করছে জাহানারা যে, এই রাত্রির ঝড় বৃষ্টি অন্ধকারের মাঝখান দিয়ে একবার ছুটে বেরোই। আর এই শাদা চুল ছিঁড়ে, এই বাতাসে উড়িয়ে এই বৃষ্টিতে ভাসিয়ে দিই। ইচ্ছা করছে যে আমার বুকখানা খুলে বজ্রের সম্মুখে পেতে দিই। ইচ্ছা করছে যে এখান থেকে আমার আত্মাকে টেনে ছিঁড়ে বার করে তা ঈশ্বরকে দেখাই! ঐ আবার গর্জন!— মেঘ! বারবার কি নিষ্ফল গর্জন করছ? তোমার আঘাতে পৃথিবীর বক্ষ খানখান করে দিতে পারো? অন্ধকার? কী অন্ধকার হয়েছ! তোমার পিছনে ঐ সূর্য, নক্ষত্রগুলোকে একেবারে গিলে খেয়ে ফেলতে পারো?

মেঘগর্জন

জাহানারা। ঐ আবার!

তিনজনে একত্রে। উহ্! কী রাত্রি।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান–গোয়ালিয়র দুর্গ। কাল—প্রভাত।

সোলেমান ও মহম্মদ

সোলেমান। শুনেছ মুহম্মদ! বিচারে কাকার প্রাণদণ্ড হয়েছে?

মহম্মদ। বিচারে নয় দাদা, বিচারের নামে। এক ব্যক্তি ছিলেন এই কাকা! আজ তাঁরও শেষ হল!

সোলেমান। মহম্মদ! তোমার শ্বশুরের কিসে মৃত্যু হয়?

মুহম্মদ। ঠিক জানি না! কেউ বলে তিনি সস্ত্রীক জলমগ্ন হন, কেউ বলে তিনি সস্ত্রীক যুদ্ধে নিহত হন। পুত্রকন্যারা আত্মহত্যা করে!

সোলেমান। তা হলে তার পরিবারের আর কেউ রইল না!

মহম্মদ। না।

সোলেমান। তোমার স্ত্রী শুনেছে?

মহম্মদ। শুনেছে। কাল সারারাত্রি কেঁদেছে; ঘুমায়নি।

সোলেমান। মহম্মদ! তোমার এতবড় দুঃখ! সইতে পারছ?

মহম্মদ। আর তোমার এ বড় সুখ! পিতা-মাতার উদ্দেশে বেরিয়েছিলে; আর দেখা হল না।

সোলেমান। আবার সে-কথা মনে করিয়ে দিচ্ছ! মহম্মদ, তুমি এত নিষ্ঠুর!—তোমার পিতা কি তোমাকে এখানে পাঠিয়েছেন, আমাকে নিত্য এইরকম দগ্ধ করতে! কোথায় আমায় সান্ত্বনা দেবে—

মহম্মদ। দাদা। যদি এই বক্ষের রক্ত দিয়ে তোমার কিছুমাত্র সান্ত্বনা হয় তো বলো আমি ছুরি এনে এইক্ষণেই আমার বুকে বসিয়ে দিই।

সোলেমান। সত্য বলেছ মুহম্মদ। এ দুঃখে সান্ত্বনা নাই। সম্পূর্ণ বিস্মৃতি এনে দিতে পারো, যদি অতীত একেবারে লুপ্ত করে দিতে পারো—দাও!

মুহম্মদ। এমন কোনো এক ঔষধ নাই কি দাদা! এমন একটা বিষ নাই যে—

সোলেমান। ঐ দেখ মহম্মদ!—সিপারকে দেখ!

সেতুর উপর সিপারের প্রবেশ

সোলেমান। ঐ দেখ ঐ বালককে—আমার ছোটভাই সিপারকে দেখ। দেখ ঐ মুখকে স্থিরমূর্তি! বুকের উপর বাহু বন্ধ করে একদৃষ্টে দূর শূন্যের দিকে চেয়ে আছে—নির্বাক! এমন ভয়ানক করুণ দৃশ্য কখনো দেখেছ মহম্মদ? —এর পরে আর নিজের দুঃখের কথা ভাবতে পারো?

মহম্মদ। উহ্ কী ভয়ানক!— সত্য বলেছ! আমাদের দুঃখ উচ্চারণ করা যায়; কিন্তু এ দুঃখ বাক্যের অতীত। বালক যখন কাঁদে, তখন যদি কাছে একটা ভীষণ আর্তনাদ ওঠে, অমনি বালকের ক্রন্দন ভয়ে থেমে যায়। তেমনই আমাদের দুঃখ এর কাছে ভয়ে নীরব হয়ে যায়।

সোলেমান। ঐ দেখ চক্ষুদুটি মুদ্রিত করে, দুই হস্ত মর্দন করছে! যেন যন্ত্রণায় হাহাকার করতে চাচ্ছে, তবু বাক্স্ফূর্তি হচ্ছে না!—সিপার! সিপার! ভাই!

সিপার একবার সোলেমানের দিকে চাহিয়া পরে চলিয়া গেল

মহম্মদ। দাদা!

সোলেমান। মহম্মদ!

মহম্মদ। আমায় ক্ষমা করো।

সোলেমান। তোমার দোষ কী!

মহম্মদ। না দাদা, আমায় ক্ষমা করো! এত পাপের ভার পিতা সইতে পারবে না। তাই তার অর্ধেক ভার আমি নিজের ঘাড়ে নিলাম! আমি ঘোরতম পাপী! আমায় ক্ষমা করো।

জানু পাতিলেন

সোলেমান। ওঠো ভাই। মহৎ উদার, বীর। তোমায় ক্ষমা করব আমি! তুমি যা সইছ, স্বেচ্ছায় ধর্মের জন্য সইছ! আমি শুধু হতভাগ্য।

মহম্মদ। তবে বলো আমার প্রতি তোমার কোনো বিদ্বেষ নাই। ভাই বলে আমায় আলিঙ্গন করো।

সোলেমান। ভাই আমার!

আলিঙ্গন

মহম্মদ। ঐ দেখ তারা কাকাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্ছে!

সোলেমান সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন—সেতুর উপরে প্রহরিগণবেষ্টিত মোরাদ প্রবেশ করিলেন

মোরাদ। [উচ্চৈঃস্বরে] আল্লা! আমার পাপের শাস্তি আমি পাচ্ছি। দুঃখ নাই; কিন্তু ঔরংজীব বাদ যায় কেন?

নেপথ্যে। কেউ বাদ যাবে না! নিক্তির ওজনে ফিরে যাবে!

সোলেমান। ও কার স্বর?
মহম্মদ। আমার স্ত্রীর।
নেপথ্যে। তার যে-শাস্তি আসছে, তার কাছে তোমার এ-শাস্তি তো পুরস্কার।— কেউ বাদ যাবে না। কেউ বাদ যায় না।
মোরাদ। [সোল্লাসে] তারও শাস্তি হবে! তবে আমায় বধ্যভূমিতে নিয়ে চলো! আর দুঃখ নাই—

সপ্রহরী মোরাদ চলিয়া গেলেন

সোলেমান। মহম্মদ! এ কী! তুমি-যে একদৃষ্টে ওদিকে চেয়ে রয়েছ? কী দেখছ?
মুহম্মদ। নরক! এ ছাড়া কি আরো একটা নরক আছে? সে কীরকম খোদা?

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—ঔরংজীবের বহিঃকক্ষ
কাল—দ্বিপ্রহর রাত্রি।

ঔরংজীব একাকী

ঔরংজীব। যা করেছি—ধর্মের জন্য। যদি অন্য উপায়ে সম্ভব হত—[বাহিরের দিকে চাহিয়া] উহ্ কী অন্ধকার!—কে দায়ী? আমি! এ বিচার, ও কী শব্দ?—না বাতাসের শব্দ!—এ কী! কোনোমতেই এ চিন্তাকে মন থেকে দূর করতে পারছি না। রাত্রে তন্দ্রায় ঢুলে পড়ি, কিন্তু নিদ্রা আসে না, [দীর্ঘনিশ্বাস] উহ্ কী স্তব্ধ! এত স্তব্ধ কেন! [পরিক্রমণ; পরে সহসা দাঁড়াইয়া] ও কী! আবার সেই দারার ছিন্নশির? সুজার রক্তাক্ত দেহ! মোরাদের কবন্ধ! যাও যাও। আমি বিশ্বাস করি না। ঐ তারা আবার। আমায় ঘিরে নাচছে!—কে তোমরা? জ্যোতির্ময়ী ধূমশিখার মতো মাঝে মাঝে আমার জাগ্রত তন্দ্রায় এসে দেখা দিয়ে যাও।—চলে যাও—ঐ মোরাদের কবন্ধ। আমায় ডাকছে; দারারও মুণ্ড আমার পানে একদৃষ্টে চেয়ে আছে; সুজা হাসছে—এ কী সব!—ওহ্! [চক্ষু ঢাকিলেন; পরে চাহিয়া] যাক! চলে গিয়েছে!—উহ্—দেহে দ্রুত রক্তস্রোত বইছে! মাথার উপর যেন পর্বতের ভার।

দিলদারের প্রবেশ

ঔরংজীব। [চমকিয়া] দিলদার?
দিলদার। জাঁহাপনা!
ঔরংজীব। এ সব কী দেখলাম?—জানো?
দিলদার। বিবেকের যবনিকার উপর উত্তপ্ত চিন্তার প্রতিচ্ছবি।—তবে আরম্ভ হয়েছে?
ঔরংজীব। কী?

দিলদার। অনুতাপ। জানতাম, হতেই হবে। এতবড় অস্বাভাবিক আচরণ—নিয়মের এতবড় ব্যতিক্রম—প্রকৃতি কি বেশিদিন সয়? সয় না।

ঔরংজীব। নিয়মের কী ব্যতিক্রম দিলদার?

দিলদার। এই বৃদ্ধ পিতাকে কারারুদ্ধ করে রাখা! জানেন জাঁহাপনা, আপনার পিতা আপনার নির্মমতায় আজ উন্মাদ!—তার উপর উপর্য্যুপরি এ ভ্রাতৃহত্যা! এতবড় পাপ কি অমনি যাবে?

ঔরংজীব। কে বলে আমি ভ্রাতৃহত্যা করেছি? এ কাজির বিচার!

দিলদার। চিরকালটা পরকে ছলনা করে কি জাঁহাপনার বিশ্বাস জন্মেছে যে নিজেকে ছলনা করতে পারেন? সেইটেই সকলের চেয়ে শক্ত! ভাইকে টুঁটি টিপে মেরে ফেলতে পারেন; কিন্তু বিবেককে শীঘ্র টুঁটি টিপে মারতে পারেন না! হাজার তার গলা চেপে ধরুন, তবু তার নিম্ন গভীর আচ্ছাদিত ভগ্নধ্বনি—হৃদয়ের মধ্যে থেকে-থেকে বেজে উঠবে—এখন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করুন।

ঔরংজীব। যাও তুমি এখান থেকে! কে তুমি দিলদার যে ঔরংজীবকে উপদেশ দিতে এসেছ?

দিলদার। কে আমি ঔরংজীব? আমি মির্জা মহম্মদ নিয়ামৎ খাঁ!

ঔরংজীব। নিয়ামৎ খাঁ হাজি! —এশিয়ার বিজ্ঞতম সুধী নিয়ামৎ খাঁ!

দিলদার। হাঁ ঔরংজীব। আমি সেই নিয়ামৎ খাঁ; শোনো, আমি রাজনীতিক অভিজ্ঞতা লাভের জন্য এসে, ঘটনাক্রমে এই পারিবারিক বিগ্রহের আবর্তের মধ্যে পড়েছিলাম। সেই অভিজ্ঞতা লাভের জন্য জঘন্য বিদূষক সেজেছি, একবার একটা সামান্য চাকুরিতেও নেমেছি; কিন্তু যে-অভিজ্ঞতা নিয়ে আজ এখান থেকে বেরোচ্ছি—মনে হয় যে সেটুকু না নিয়ে গেলে ছিল ভালো। ঔরংজীব! ভেবেছিলে যে আমি তোমার রৌপ্যের জন্য এতদিন তোমার দাসত্ব করছিলাম? বিদ্যার এখনও এ তেজ আছে যে, সে ঐশ্বর্যের মস্তকে পদাঘাত করে। আমি চললাম সম্রাট।

গমনোদ্যত

ঔরংজীব। জনাব!

দিলদার। না, আমায় ফেরাতে পারবে না ঔরংজীব!—আমি চললাম। তবে একটা কথা বলে যাই, মনে ভাবছ যে এই জীবনসংগ্রামে তোমার জয় হয়েছে? না, এ তোমার জয় নয় ঔরংজীব! এ তোমার পরাজয়। বড় পাপের বড় শাস্তি।—অধঃপতন। তুমি যত ভাবছ উঠছ, সত্যসত্য তুমি ততই পড়ছ। তারপর যখন তোমার যৌবনের নেশা ছুটে যাবে, যখন শাদা চোখে দেখবে যে, নিজের আর স্বর্গের মধ্যে কী মহা ব্যবধান খনন করছ, তখন তার পানে চেয়ে তুমি শিউরে উঠবে। মনে রেখো।

[প্রস্থান]

[ঔরংজীব নতশিরে বিপরীত দিকে চলিয়া গেলেন]

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—আগ্রার প্রাসাদ-অলিন্দ। কাল—অপরাহ্ন।

জাহানারা, জহরৎ উন্নিসা বসিয়া গল্প করিতেছিলেন

জাহানারা। জহরৎ উন্নিসা! ঔরংজীবের মতো এমন সৌম্য, সহাস্য মনোহর পাষণ্ড দেখেছ কি মা?

জহরৎ। না। আমার একটা ভয় হয় পিসিমা! ভিতরে এত ক্রূর, বাহিরে এত সরল; ভিতরে এত প্রবল, বাহিরে এত স্থির; ভিতরে এত বিষাক্ত, আর বাহিরে এত মধুর।—এও কি সম্ভব! আমার ভয় হয়!

জাহানারা। আমার কিন্তু একটা ভক্তি হয়। বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে যাই যে, মানুষ এমন হাসতে পারে—আর সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঘ্রের লোলুপ চাহনি চাইতে পারে; এমন মৃদু কথা কইতে পরে—যখন সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের বিদ্বেষের জ্বালায় জ্বলে যাচ্ছে; ঈশ্বরের কাছে এমন হাতজোড় করতে পারে—যখন ভিতরে নূতন শয়তানি মতলব করছে।—বলিহারি!

জহরৎ। ঠাকুর্দাকে এইরকম বন্দি করে রেখেছেন অথচ রাজকার্যে তাঁর উপদেশ চেয়ে পাঠাচ্ছেন। তাঁর সম্মুখে তাঁর পুত্রদের একে একে হত্যা করছেন—অথচ প্রতিবারই তাঁর ক্ষমা চেয়ে পাঠাচ্ছেন। যেন কত লজ্জা, কত সঙ্কোচ। —অদ্ভুত! ঐ যে ঠাকুর্দা আসছেন।

সাজাহানের প্রবেশ

সাজাহান। দেখ কেমন সেজেছি জাহানারা, দেখ জহরৎ উন্নিসা! ঔরংজীব এ রত্ন সব পাছে চুরি করে নেয়—তাই আমি পরে পরে বেড়াচ্ছি। কেমন দেখাচ্ছে! [জহরৎকে] আমাকে তোর বিয়ে করতে ইচ্ছে হচ্ছে না?

জহরৎ। আবার জ্ঞান হারিয়েছেন! উন্মত্ততা মাঝে মাঝে চন্দ্রের উপর শরতের মেঘের মতো এসে চলে যাচ্ছে।

সাজাহান। [সহসা গম্ভীর হইয়া] কিন্তু খবরদার! বিয়ে করিসনি। [নিম্নস্বরে] ছেলে হলে তোকে কয়েদ করে রেখে দেবে, তোর গহনা কেড়ে নেবে! বিয়ে করিস না!

জাহানারা। দেখছ মা। এ উন্মত্ততা নয়। এর সঙ্গে জ্ঞান জড়ানো রয়েছে। এ যেন একটা ছন্দে বিলাপ।

জহরৎ। জগতে যতরকম করুণ দৃশ্য আছে, জ্ঞানী উন্মাদের মতো করুণ দৃশ্য বুঝি আর নাই। একটা সুন্দর প্রতিমা যেন ভেঙে ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে!—উহ্ বড় করুণ!

[চক্ষে বস্ত্র দিয়া প্রস্থান]

সাজাহান। আমি উন্মাদ নই জাহানারা! গুছিয়ে বলতে পারি—চেষ্টা করলে গুছিয়ে বলতে পারি!

জাহানারা। তা জানি বাবা।

সাজাহান। কিন্তু আমার হৃদয় ভেঙে গিয়েছে। এতবড় দুঃখ ঘাড়ে করে-যে বেঁচে আছি, তাই আশ্চর্য! দারা, সুজা, মোরাদ—সবাইকে মারলে? আর তাদের একটা ছেলেও রইল না প্রতিহিংসা নিতে।—সব মারলে!

ঔরংজীবের প্রবেশ

সাজাহান। এ কে? (সভীত বিস্ময়ে) এ-যে সম্রাট!

জাহানারা। [আশ্চর্যে] তাই তো, ঔরংজীব!

ঔরংজীব। পিতা!

সাজাহান। আমার মণিমুক্তা নিতে এসেছ! দেব না, দেব না! এক্ষণই সব লোহার মুগুর দিয়ে গুঁড়ো করে ফেলব।

গমনোদ্যত

ঔরংজীব। [সম্মুখে আসিয়া] না পিতা, আমি মণিমুক্তা নিতে আসিনি।

জাহানারা। তবে বোধহয় পিতাকে বধ করতে এসেছ! পিতৃহত্যাটা আর বাকি থাকে কেন। হয়ে যাক।

সাজাহান। বধ করবে! আমায় হত্যা করবে! করো ঔরংজীব! আমাকে হত্যা করো! তার বিনিময়ে এইসব মণিমুক্তা তোমায় দেব; আর—মরবার সময় তোমায় এই অনুগ্রহের জন্য আশীর্বাদ করে মরব। এই লোল বক্ষ খুলে দিচ্ছি। তোমার ছুরি বসিয়ে দাও।

ঔরংজীব। [সহসা জানু পাতিয়া] আমাকে এর চেয়ে আরও অপরাধী করবেন না পিতা! আমি পাপী। ঘোরতর পাপী। সেই পাপের প্রদাহে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছি। দেখুন পিতা—এই শীর্ণ দেহ, এই কোটরগত চক্ষু, এই শুষ্ক পাণ্ডুর মুখ তার সাক্ষ্য দিবে।

সাজাহান। শীর্ণ হয়ে গিয়েছ। সত্য, শীর্ণ হয়ে গিয়েছ।

জাহানারা। ঔরংজীব! ভূমিকার প্রয়োজন নাই। এখানে একজন আছে সে তোমায় বেশ জানে। নূতন কী শয়তানি মতলব করে এসেছ বলো! কী চাও এখানে?

ঔরংজীব। পিতার মার্জনা।

জাহানারা। মার্জনা! এটা তো খুব নূতন রকম করেছ ঔরংজীব!

ঔরংজীব। আমি জানি ভগ্নী—

জাহানারা। স্তব্ধ হও।

সাজাহান। বলতে দেও জাহানারা। বলো, কী চলতে চাও ঔরংজীব?

ঔরংজীব। কিছু বলতে চাই না। শুধু আপনার মার্জনা চাই।

জাহানারা ব্যঙ্গহাসি হাসিলেন

ঔরংজীব। [একবার জাহানারার পানে চাহিয়া পরে সাজাহানকে কহিলেন] যদি এ প্রার্থনা কপট বিবেচনা করেন, তো পিতা আসুন আমার সঙ্গে; আমি এই দণ্ডে প্রাসাদদুর্গের দ্বার খুলে দিচ্ছি; আর আপনাকে আগ্রার সিংহাসনে সর্বজনসমক্ষে বসিয়ে সম্রাট বলে অভিবাদন করছি। এই আমার

রাজমুকুট পদতলে রাখলাম।

এই বলিয়া ঔরংজীব মুকুট খুলিয়া সাজাহানের পদতলে রাখিলেন

সাজাহান। আমার হৃদয় গলে যাচ্ছে, গলে যাচ্ছে।

ঔরংজীব। আমায় ক্ষমা করুন পিতা।

চরণদ্বয় জড়াইয়া ধরিলেন

সাজাহান। পুত্র!

ঔরংজীবকে ধরিয়া উঠাইয়া পরে নিজের চক্ষু মুছিলেন

জাহানারা। এ উত্তম অভিনয় ঔরংজীব!

সাজাহান। কথা কোস্ নে জাহানারা! পুত্র আমার পা জড়িয়ে আমার ক্ষমা ভিক্ষা চাচ্ছে। আমি কি তা না দিয়ে থাকতে পারি? হা রে বাপের মন! এতদিন ধরে তোর হৃদয়ের নিভৃতে বসে এইটুকুর জন্য আরাধনা করিছিলি! এক মুহূর্তে এই ক্রোধ গলে জল হয়ে গেল।

ঔরংজীব। আসুন পিতা—আপনাকে আবার আগ্রার সিংহাসনে বসাই। বসিয়ে মক্কায় গিয়ে আমার মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত করি।

সাজাহান। না, আমি আর সম্রাট হয়ে বসতে চাই না। আমার সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে—এ সাম্রাজ্য তুমি ভোগ করো পুত্র! এ মণিমুক্তা মুকুট তোমার! আর মার্জনা! ঔরংজীব—ঔরংজীব। না সেসব মনে করব না! ঔরংজীব! তোমার সব অপরাধ ক্ষমা করলাম।

চক্ষু ঢাকিলেন

জাহানারা। পিতা! দারার হত্যাকারীকে ক্ষমা!

সাজাহান। চুপ! জাহানারা! এ সময়ে আমার সুখে আর ঘা দিস নে। তাদের তো আর ফিরে পাব না। সাত বৎসর দুঃখে কেটেছে, এতদিন বড় জ্বালায় জ্বলেছি। শোকে উন্মাদ হয়ে গিয়েছি। দেখেছিস তো—একদিন সুখী হতে দে! তুইও ঔরংজীবকে ক্ষমা কর্ মা।

ঔরংজীব। আমাকে ক্ষমা করো ভগ্নী।

জাহানারা। চাইতে পারছ? পিতার মতো আমার স্থবিরত্ব হয়নি। রাজদস্যু! ঘাতক! শঠ!

সাজাহান। তোর মতো মাতৃহারা জাহানারা—তোরই মতো বেচারি! ক্ষমা কর্। ওর মা যদি এখন বেঁচে থাকত, সে কী করত জাহানারা? —তাই সেই মায়ের ব্যথা-যে সে আমার কাছে জমা রেখে গিয়েছে। কি জাহানারা? তবু নিস্তব্ধ! চেয়ে দেখ্ এই সন্ধ্যাকালে ঐ যমুনার দিকে—দেখ্ যে কী স্বচ্ছ! চেয়ে দেখ্ ঐ আকাশের দিকে—দেখ্ সে কী গাঢ়! চেয়ে দেখ্ ঐ কুঞ্জবনের দিকে—দেখ্ সে কী সুন্দর! আর চেয়ে দেখ্ ঐ প্রস্তরীভূত প্রেমাশ্রু, ঐ অনন্ত আক্ষেপের আপ্লুত বিয়োগের অমরকাহিনী—ঐ স্থির মৌন নিষ্কলঙ্ক শুভ্র মন্দির, ঐ তাজমহলের দিকে চেয়ে দেখ্—সে কী করুণ! তাদের দিকে চেয়ে ঔরংজীবকে ক্ষমা কর্—আর ভাবতে চেষ্টা কর্ যে—এ সংসারকে যত খারাপ ভাবিস—সে তত খারাপ নয়। জাহানারা!

জাহানারা। ঔরংজীব! এখানে তোমার জয় সম্পূর্ণ হল। ঔরংজীব—আমার এই জীর্ণ মুমূর্ষু পিতার অনুরোধে আমি তোমায় ক্ষমা করলাম।

মুখ ঢাকিলেন

বেগে জহরৎ উন্নিসার প্রবেশ

জহরৎ। কিন্তু আমি ক্ষমা করি নাই ঘাতক! পৃথিবী সুদ্ধ যদি তোমায় ক্ষমা করে, আমি করব না। আমি তোমায় অভিশাপ দিচ্ছি; ক্রুদ্ধ ফণিনীর উষ্ণ নিশ্বাসে আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি। সে-অভিশাপের ভৈরব ছায়া যেন একটা আতঙ্কের মতো তোমার আহারে বিহারে—তোমার পিছনে পিছনে ফিরে; নিদ্রায় সেই অভিশাপের পর্বতভার যেন তোমার বক্ষে চেপে ধরে। সেই অভিশাপের বিকট ধ্বনি যেন তোমার সকল বিজয়বাদ্যে বেসুরো বেজে উঠে। তুমি আমার পিতাকে হত্যা করে সে-সাম্রাজ্য অধিকার করছ, আমি অভিশাপ দেই, যেন তুমি দীর্ঘকাল বাঁচো, আর এই সাম্রাজ্য ভোগ করো; যেন সেই সাম্রাজ্য তোমার কালস্বরূপ হয়; যেন সে পাপ থেকে কেবল গাঢ়তর পাপে তোমায় নিক্ষেপ করে, যাতে মরবার সময় তোমার ঐ উত্তপ্তললাটে ঈশ্বরের করুণার এককণাও না পাও।

সাজাহান, ঔরংজীব ও জাহানারা তিনজনেই শির অবনত করিলেন।

যবনিকা পতন

চিরায়ত গ্রন্থমালা

এবং

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়

বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন

দেশ ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে

পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এই বইটি 'চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা'র

অন্তর্ভুক্ত।

বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র